MANGO

BY

RAJA KAMAL KRISHNA SINGHA.

আম্র।

রাজ শ্রীকমলকৃষ্ণ সিংহ

প্রণীত।

কলিকাতা

৪৬নং পঞ্চাননতলা লেন, ভারতমিহির যন্ত্রে,

সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা

মুদ্রিত

ও

সুসঙ্গ-দুর্গাপুর হইতে

শ্রীগোলোকচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১২৯৮ সন।

বিজ্ঞাপন।

আম্র ভারতের অত্যুৎকৃষ্ট ফল। এই ফল যেমন সুস্বাদু, তেমনই গুণসম্পন্ন। রোপণের দোষে এবং কলম করিবার প্রণালী না জানা থাকা নিবন্ধন অনেক স্থলের অনেক ভাল ভাল আম দিন দিন লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। সেই ক্ষতি নিবারণের উদ্দেশে এবং আম্র সম্বন্ধে অনেক আবশ্যকীয় বিষয় সাধারণের বিদিত করার নিমিত্ত "আম্র" নামে এই গ্রন্থ প্রণীত হইল। ইহা দ্বারা সাধারণের কথঞ্চিৎ উপকার দর্শিলেও সকল পরিশ্রম সফল বোধ করিব।

এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, এই গ্রন্থ প্রণয়ন সম্বন্ধে ব্যবসায়ী ও কৃষিতত্ত্ব প্রভৃতি সাময়িক পত্রাদি হইতে কিছু কিছু সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

সুসঙ্গ-দুর্গাপুর, রাজধানী।
ময়মনসিংহ।
১২৯৮ বঙ্গাব্দ। ২রা মাঘ।

শ্রীকমলকৃষ্ণ সিংহ শর্ম্মা।

সূচীপত্র।

আম্র।

আম্র মানব রসনার পরম তৃপ্তিকর উপাদেয় খাদ্য। ইহাকে সকল জাতীয় ফলের শীর্ষ স্থানীয় বলিলেও বোধ করি অত্যুক্তি হয় না; কারণ আম্রের ন্যায় সুরসাল ফল এপর্য্যন্ত কোন দেশে জন্মিয়াছে বলিয়া শ্রুতি গোচর হয় নাই। উহা যেমন সদ্গন্ধ যুক্ত, তেমনই সুস্বাদ বিশিষ্ট। আম্র কাঁচা, পাকা সকল অবস্থাতেই মনুষ্যের নানাবিধ খাদ্যে ব্যবহৃত হইয়া রসনার প্রভূত তৃপ্তি সাধন করিয়া থাকে। প্রাচীন আর্য্য গ্রন্থাবলীতে আম্রের ভূয়সী প্রশংসা বর্ণিত হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় ইহার আম্র, চূত, রসাল ও সহকার ইত্যাদি বহুল নাম দৃষ্ট হয়। আর্য্য কবিগণ ইহার নব-

কিশলয় দ্বারা সুরবালার ন্যায় তাপস-তনয়াগণের কর্ণাভরণ রচনা করিয়া জগতের চক্ষু সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন করিতে আকর্ষণ করিয়াছেন; সহকার তরুর সহিত মাধবী লতিকার বিবাহ দিয়া প্রকৃতি রাজ্যে মহা মহোৎসবের সৃষ্টি করিয়াছেন;—চূত মুকুল নির্গমনের সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমর গুঞ্জন ও কোকিল ঝঙ্কারে বসন্ত সমাগম ঘোষণা করিয়া প্রকৃতিকে মাতাইয়া তুলিয়াছেন!—জগৎ স্তিমিতনেত্রে সেই মধুরে মধুর মিশ্রণ সন্দর্শন ও মধুরে মধুর নিক্কণ আকর্ণন করিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে! আজিও সংস্কৃত-কাব্যকাননে বিচরণ করিতে গেলে সহকারের সেই মধুর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া কেনা মোহিত হইবেন? হিন্দুসমাজে আজিও আম্রের এতদূর গৌরব আছে যে, তাঁহারা বৎসরের প্রথমে সুপক্ক আম্র ফল প্রাপ্ত হওয়া মাত্র তাহা মৃত পিতৃ পুরুষগণের উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়া থাকেন। প্রতিবর্ষে পক্কাম্র ফল পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে উৎসর্গ না করিয়া কখন তাহা মুখে দেন না। আর্য্যসন্তানগণ প্রায় প্রত্যেক মাঙ্গলিক ও দৈবকার্য্যে সপল্লব আম্র শাখার ব্যবহার করিয়া থাকেন। আর্য্যগণের গৃহে,

দ্বারে, প্রাঙ্গনে অনেক সময় ঘট-শীর্ষে সপল্লব আম্র শাখা শোভা পাইতে দেখা যায়। আম্রের মধু-রাস্বাদনে মুগ্ধ হইয়াই বোধ হয় এদেশীয়গণ ইহার "মধুফল" নাম প্রদান করিয়াছেন। আম্র যে কেবল আমাদের দেশেই অধিক আদরণীয় তাহা নহে; ইহা সকল দেশে তুল্যরূপ সমাদরে গৃহীত হইয়া আসিতেছে।

আসিয়া মহাদেশই আম্রের জন্ম স্থান। আম্র আসিয়ারই গৌরবের সম্পত্তি। আসিয়ার সমকটি-বন্ধস্থ প্রায় সমস্ত দেশেই আম্র জন্মিয়া থাকে; তন্মধ্যে ভারতের আম সমধিক প্রসিদ্ধ। ভারতের শীত-প্রধান পার্ব্বত্য প্রদেশ এবং নিবিড় জঙ্গলা-কীর্ণ ও নিম্ন জলাভূমি ব্যতীত প্রায় সকল স্থানেই প্রচুর পরিমাণে আম্র জন্মিয়া থাকে। বোম্বাই ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশে অনেক ভাল ভাল আম্র উৎপন্ন হয়। বঙ্গদেশের মধ্যে মালদহের আম্র বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহা ব্যতীত নদীয়া, হুগ্‌লী, মুর্শীদাবাদ, বগুড়া ও রাজসাহীর অনেক স্থানে অনেক প্রকার উৎকৃষ্ট আম্র জন্মিয়া থাকে। অধুনা কলিকাতা এবং তাহার নিকটবর্ত্তী কোন

কোন স্থানে অনেক ব্যক্তি আপন আপন বাগানে নানাস্থান হইতে নানাবিধ উৎকৃষ্ট আম্রের কলম আনিয়া রোপণ করিয়ছেন; সুতরাং সেই সকল স্থানেও অনেক প্রকার উৎকৃষ্ট আম্র উৎপন্ন হইতেছে।

বৃক্ষ-তত্ত্ব।

আম্র বৃক্ষের কাণ্ড সচরাচর আট হইতে চৌদ্দ, পনের হাত পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে। ইহার শাখা প্রশাখা অনেক হয়। পত্রগুলি বিপর্য্যস্ত, ক্রম সূক্ষ্ম, অবিভক্ত, শক্ত এবং গাঢ় ও উজ্জ্বল হরিৎবর্ণ বিশিষ্ট; দীর্ঘে প্রায় বার চৌদ্দ অঙ্গুলি এবং প্রস্থে প্রায় তিন কি সাড়ে তিন অঙ্গুলি পরিমাণ হইয়া থাকে। ইহার ফুল পাঁচটী পাঁপড়ী যুক্ত, ঈষৎ পীতবর্ণ ও পাঁপড়ীর মূলদেশ রক্তবর্ণ রেখা বিশিষ্ট হয়; ঐ ফুলের মধ্যে অধিকাংশই পুংকেশর এবং একটী মাত্র এক প্রাকোষ্টিক গর্ব্ভাশয় দেখা যায়। ফল দীর্ঘ, খর্ব্ব প্রভৃতি নানা আকারের এবং হরিৎ, পীত, অথবা অর্দ্ধরক্ত ও অর্দ্ধ পীত ইত্যাদি নানাবর্ণের হইয়া থাকে।

আম্র বীজ আকারে ঈষদ্ বক্র। ইহার অভ্যন্তরস্থ শ্বেতসার দুই ভাগে বিভক্ত। বীজাভ্যন্তরস্থ উদ্ভিদ ভ্রূণ অঙ্কুরিত হইবার সময়, ঐ শ্বেতসার স্বাভাবিক নিয়মে শর্করাকার ধারণ করে, পরে ঐ শর্করা জলে দ্রব হইলে বালোদ্ভিদ উহা সহজে শোষণ করিয়া পরিবর্দ্ধিত হয়।

আম্রবৃক্ষ দ্বিবীজ পত্রী বা দ্বিবীজদল জাতীয় উদ্ভিদ। যে সকল উদ্ভিদের অঙ্কুর দুইটী পত্রসহ বহির্গত হয়, তাহাদিগকে দ্বিবীজপত্রী বা দ্বিবীজদল জাতীয় উদ্ভিদ বলা যায়। এই জাতীয় উদ্ভিদের একটী মূল শিকড় হইতে অপর কতকগুলি শিকড় বাহির হইয়া থাকে। সেই শিকড় গুলিকে উদ্ভিদ বেত্তাগণ প্রকৃত শিকড় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

মৃত্তিকা।

আম্র বৃক্ষের জন্য সাধারণতঃ উচ্চ এবং অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ চিক্কণের (এঁটেলের) ভাগ বিশিষ্ট দোআঁশ মৃত্তিকাই উৎকৃষ্ট। যে স্থান হইতে বর্ষার জল নিষ্কাসিত হইতে পারে না, বৃষ্টি হইলেই জল জমিয়া থাকে; আম্র বাগানের

নিমিত্ত এরূপ স্থান মনোনীত করা কর্ত্তব্য নয়; বিশেষতঃ বর্ষার কয়েক মাস বৃক্ষ মূলে নিয়ত জল সঞ্চিত থাকিলে, ফলের আস্বাদন অধিকাংশ স্থলে বিকৃত হইয়া যায়, আবার অধিক বালির ভাগ বিশিষ্ট স্থানে আম্র বৃক্ষ রোপণ করিলে ঐ গাছ ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং ফল আকারে ক্ষুদ্র, অম্লস্বাদ বিশিষ্ট এবং তাহার আঁটি বৃহৎ হইয়া থাকে।

চারা করিবার প্রণালী।

আম্র বৃক্ষের চারা সাধারণতঃ দুই প্রণালীতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এক বীজ হইতে; অপর শাখা হইতে। বীজ হইতে উৎপন্ন চারাকে আঁটির চারা এবং শাখা হইতে উৎপন্ন চারাকে কলমের চারা বলা যায়। আঁটির চারা গুলিতে দীর্ঘ দিনে ফল ধরে এবং অনেক স্থলে ঐ ফল আকারে কিম্বা স্বাদে মূল বৃক্ষের উৎপন্ন ফলের অনুরূপ হয় না। কলমের চারাগুলি, সত্বর ফলবান্ হয় এবং অধিকাংশ স্থলে ঐ ফল আকারেও স্বাদে ঠিক মূল বৃক্ষের ফলের অনুরূপ হইয়া থাকে। এই জন্য

এক্ষণে অনেকেই আঁটির চারা হইতে কলমের চারার অধিক পক্ষপাতী হইয়াছেন। এমন কি কোন কোন ব্যক্তি নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে আঁটির চারা না লাগাইয়া শুধুই কলমের চারা লাগাইতে উপদেশ করিয়াছেন; কিন্তু দুঃখের সহিত আমরা সে মতের অনুগামী হইতে পারিলাম না;—কারণ কলমের চারায় মূল বৃক্ষের অনুরূপ ফল হইবার যেমন একটী উৎকৃষ্ট গুণ আছে, তেমনই কয়েকটী গুরুতর দোষও আছে। কলমের চারাগুলি মূল-বৃক্ষের উপশাখা হইতে উৎপন্ন হয়; সুতরাং বহু-যত্নে ও উহারা আর আঁটির চারার অনুরূপ বৃহদা-কৃতি ধারণ করিতে পারে না; কাজেই উহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল আঁটির বৃক্ষের অনুরূপ বর্দ্ধিত হইতে অসমর্থ হয়। বিশেষতঃ এই অপরিস্ফুটাঙ্গ কলমের চারা সকল সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন আঁটির চারা হইতে স্বতই অচিরজীবী হইয়া থাকে। এক্ষণে দিন দিন কলম হইতে কলম এবং তাহা হইতে কলম হইতে চলিয়াছে;—ইহা দ্বারা আম্র বৃক্ষ সকলকে ক্রমে অল্পজীবী হইবার পথ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হইতেছে। কারণ আট নয় বৎসর বয়-

সের পূর্ব্বে কোন বৃক্ষের শাখাই প্রায় কলম বান্ধিবার উপযোগী হয় না। নয় বৎসর বয়স্ক বৃক্ষের শাখায় কলম বান্ধিলে, সেই কলমের চারা মূল বৃক্ষের সঙ্গে সঙ্গে নয় বৎসর আয়ুক্ষয় করিয়া জন্ম গ্রহণ করে; ঐ কলমের চারাটী আবার চারি পাঁচ বৎসর বয়স্ক না হইলে তাহার শাখা কলম বান্ধার উপযুক্ত হয় না; সেই কলমের গাছের শাখায় পুনর্ব্বার কলম বান্ধিলে সেই কলমের জীবন ঐ হিসাবে চৌদ্দ বৎসর ন্যূন হইবে। এইরূপ ক্রমে কলম হইতে কলমান্তর উৎপাদন করিতে গেলে তাহাদের জীবন কাল যে ক্রমে ক্ষয় হইয়া আসিবে, তাহা অনায়াসেই বুঝা যাইতে পারে। আঁটি হইতে চারা উৎপাদন রহিত করিয়া কেবল কলমের চারা করিবার প্রণালী স্থিরতর রাখিলে বোধ হয় অনেকটা ক্ষতির কারণ হইয়া উঠিবে। বরং আঁটিজাত বৃক্ষ হইতে উৎকৃষ্ট আম্র জন্মাইবার চেষ্টা করিলে ফল অনেকটা ভাল হইতে পারে, এই নিমিত্ত অমাদের মতে উভয় প্রণালী প্রবর্ত্তিত রাখাই কর্ত্তব্য।

আঁটির চারা।

চারা করিবার নিমিত্ত ভাল ভাল আম্রের বীজ অর্থাৎ আঁটি সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। জ্যৈষ্ঠ হইতে ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত নানা জাতীয় আম্র খাইয়া তাহার মধ্য হইতে ভাল জাতীয় আম্রের আঁটি সংগ্রহ করা যাইতে পারে। যে জাতীয় আম্রের চারা করিতে ইচ্ছা করিবে, সেই জাতীয় সুপক্ক আম্রের ত্বক ও শাস হাত দিয়া ছাড়াইয়া পরে তাহা জলে ধুইয়া এরূপ পরিষ্কার করিবে যে, তাহাতে কিছু-মাত্র শাস না থাকে। তৎপর ঐ পরিষ্কৃত আঁটি-গুলিকে তিন চারি ঘণ্টা কাল রৌদ্রে রাখিয়া শুষ্ক করিয়া নিবে। এই প্রকার আঁটি চারা করিবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। আঁটি সংগ্রহ সম্বন্ধে অনেকে অনেক মত বলিয়া থাকেন, কিন্তু আমরা উপরের লিখিত প্রণালীকেই উৎকৃষ্ট মনে করি।

চারার জন্য আমের আঁটি দুই প্রণালীতে লাগান হইয়া থাকে। এক কোন স্থানে প্রথমতঃ চারা জন্মাইয়া পরে ঐ চারা সেই স্থান হইতে উঠাইয়া স্থায়ী-স্থানে রোপণ করা; দ্বিতীয় এক কালীন স্থায়ীস্থানে আঁটি রোপণ করা। বাগানের

নিমিত্ত চারা করিতে হইলে প্রথম প্রণালী অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য; কারণ ভাল চারা উৎপাদনের নিমিত্ত একটু বিশেষ যত্নের প্রয়োজন। অধিক সংখ্যক চারার জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সেই প্রকার যত্ন করা সুকঠিন হইয়া পড়ে; এই নিমিত্ত ঐরূপ স্থলে আমরা প্রথমতঃ একস্থানে চারা করিয়া পরে তাহা বাগানের স্থায়ীস্থানে রোপণ করাই সুবিধাজনক মনে করি; কারণ তাহা হইলে একস্থানে একসময়ে অল্প আয়াসে অধিক সংখ্যক চারার যত্ন ও পরে সুবিধামত ক্রমে ক্রমে ঐ সকল চারা উঠাইয়া স্থানান্তরিত করা যাইতে পারে। যাঁহারা দুই চারিটী মাত্র গাছ লাগাইবেন, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে আঁটি এক কালীন স্থায়ীস্থানেও লাগাইতে পারেন।

আম্রের চারা করিতে হইলে কোন স্নিগ্ধ ও দোআঁশ মৃত্তিকা যুক্ত স্থান খনন করিয়া তাহার কঙ্করাদি বাছিয়া ফেলিবে, এবং ঐ মৃত্তিকার সহিত তাহার শিকিভাগ দগ্ধ মৃত্তিকা উত্তমরূপে মিশাইয়া লইবে। সাধারণতঃ জ্ঞাত থাকা উচিত যে, স্থায়ীস্থানের অর্থাৎ বাগানের মৃত্তিকা হইতে চারা করি-

বার স্থানের মৃত্তিকা অনুর্ব্বরা হওয়া কর্ত্তব্য। কারণ অনুর্ব্বরা স্থানে চারা জন্মিলে, তথা হইতে উঠাইয়া উর্ব্বরা স্থানে লাগাইবা মাত্র ঐ চারা অধিক পরিমাণে সার পাইয়া সহজেই পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে। চারার জন্য মৃত্তিকা প্রস্তুত হইলে পর তাহাতে পূর্ব্বোক্ত প্রণালীমতে সংগৃহীত বীজ সকল শ্রেণীপূর্ব্বক পরস্পর অর্দ্ধহস্ত ব্যবধানে রোপণ করিবে। চারা করিবার বীজ সকল যত টাট্‌কা হয়, ততই উত্তম। বীজ রোপণ করিবার সময় উহার বক্রভাগ উপরের দিগে রাখিয়া রোপণ করিবে। ঐ রূপ রোপণ করিবার কারণ এই যে, স্বভাবতই আমের চারা আঁটির মুখ অর্থাৎ যে দিগে আমের বোঁটা থাকে, সেইদিগ হইতে আঁটির বক্রভাগের অভিমুখেও শিকড় সোজাসোজি ঠিক তাহার বিপরীত দিগে বাহির হইয়া থাকে; সুতরাং বক্রভাগ উপরের দিগে রাখিয়া আঁটি রোপণ করিলে প্রকৃতির নিয়ম মত ঐ আঁটি হইতে চারা সহজ পথে নির্গত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে। বীজ খাড়া করিয়া অথবা কাইত করিয়া কিম্বা উহার বক্রভাগ নীচে রাখিয়া রোপণ করিলে যে তাহা হইতে চারা

উৎপন্ন হইবে না এমন নয়; তবে ঐ ভাবে উৎপন্ন চারা সকল জন্মিবার সময়েই স্বাভাবিক শক্তি বিকাশে বাধা পাইয়া থাকে। কারণ বিশ্বনিয়ন্তা বীজ হইতে সপত্রকাণ্ড এবং শিকড় নির্গমনের যে যে স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহারা সেই সেই স্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থান হইতে নির্গত হইতে পারে না। বীজ অস্বাভাবিক রূপে স্থাপিত হইলে চারা ও মূল যথাস্থান হইতে নির্গত হইয়া পরে বাঁকিয়া স্বাভাবিক পথ অবলম্বন করে। ইহা দ্বারা চারা সকল উদ্যম জীবনেই কতকটা কষ্ট পাইয়া থাকে; এই নিমিত্ত উন্নতি চিকীর্ষু ব্যক্তিগণের এ বিষয়ে সতর্কতা গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। আঁটি সকল অর্দ্ধেক পরিমাণ মাটীর নীচে পুঁতিয়া তদুপরি উলুর পচা খড় বিস্তৃত করিয়া রাখিবে; তৎপর আবশ্যক মত উহাতে জলসেচন ও ছায়াদান করিবে। এই প্রকারে রোপিত আঁটি হইতে সাধারণতঃ বিশ, একুশ দিনে চারা অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। কখন কখন তেইশ, চব্বিশ দিনেও চারা অঙ্কুরিত হইতে দেখা গিয়াছে। চারা উৎপন্ন হইলে সেই বৎসর আশ্বিন কিম্বা কার্ত্তিক মাসে চারাগুলি উঠাইয়া

অন্য কোন দোআঁশ মৃত্তিকাযুক্তস্থানে শ্রেণীপূর্ব্বক এক এক হাত অন্তর লাগাইয়া দিবে, ঐ সময় যে সকল চারার পাতার ও কাণ্ডের কোমলত্ব বিদূরিত হইয়া অপেক্ষাকৃত শক্ত হইয়াছে দেখিবে, তাহা-দিগকেই উঠাইয়া লাগাইবার উপযুক্ত বলিয়া মনে করিবে। চারার পাতা ও কাণ্ড কোমল থাকার অবস্থায় উঠাইয়া লাগাইলে অধিকাংশ চারাই মরিয়া যাইবার সম্ভাবনা, এই নিমিত্ত এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। চারাগুলি উঠা-ইয়া লাগাইবার পর কিছুদিন পর্য্যন্ত কোন প্রকার আচ্ছাদন দিয়া প্রখর সূর্য্যোত্তাপ হইতে উহা-দিগকে রক্ষা করিবে; এবং বর্ষাগমের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আবশ্যক মত ঐ নব রোপিত চারা সকলে উপযুক্ত পরিমাণ জল সেচন করিবে। দ্বিতীয় বৎসরের আশ্বিন কিম্বা কার্ত্তিক মাসে ঐ চারা গুলিকে পুন-র্ব্বার উঠাইয়া পূর্ব্বের ন্যায় অন্য একটী স্থানে শ্রেণীপূর্ব্বক লাগাইয়া দিবে এবং উহাদিগের প্রতি পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় যত্ন করিবে। তৃতীয় বৎসর শরৎ ঋতুতে অথবা বসন্ত ঋতুর প্রথম ভাগে ঐ চারাগুলি উঠাইয়া প্রত্যেক চারার মূল শিকড়ের

অগ্রভাগের কোমল অংশ টুকু কোন সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা কাটিয়া পরে চারাগুলি বাগানের স্থায়ী স্থানে লাগাইয়া দিবে। মূল শিকড়ের অগ্রভাগ কাটিবার সময় যাহাতে গাছে অন্য কোন রূপ আঘাত না লাগে এরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। সুতীক্ষ্ণ কাঁচি দ্বারা কাটিতে পারিলেই ভাল হয়। মূল শিকড়ের অগ্রভাগ কাটিয়া দিবার কারণ এই যে যতদিন পর্য্যন্ত ঐ শিকড় নিম্নাভিমুখে গমন করে, ততদিন পর্য্যন্ত গাছে ফল ধরে না। মূল শিকড়ের অগ্রভাগের কোমলাংশ কোন কারণ বশতঃ পচিয়া অথবা ছিন্ন হইয়া গেলেই উহার নিম্ন গমন রহিত হইয়া পড়ে এবং তাহার পরেই গাছে ফল ধরিয়া থাকে; সুতরাং সত্বর ফল পাইবার ইচ্ছা করিলে মূল শিকড়ের অগ্রভাগ কাটিয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য; কারণ তাহা হইলে মূল শিকড় আর নিম্নাভিমুখে গমন করিতে পারে না, এই হেতু গাছও শীঘ্র ফলবান্ হইয়া থাকে। প্রত্যেক বারে চারা উঠাইয়া লাগাইবার সময় এরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য যে, ঐ চারার চারিদিকের ছোট ছোট শিকড় গুলি কাটিয়া কিম্বা ছিঁড়িয়া না

যায়, কারণ উহারাই চারিদিক্ হইতে রস সংগ্রহ করিয়া চারার দেহ পরিপুষ্ট করিয়া থাকে। ঐ সকল শিকড় কাটিয়া কি ছিঁড়িয়া গেলে চারার সে পোষণ শক্তির ব্যাঘাৎ জন্মে, সুতরাং তাহাতে কোনটী বা নিস্তেজ হইয়া পড়ে, কোনটী বা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া চিরবিদায় গ্রহণ করে। এই নিমিত্ত চারার মূলস্থান হইতে কিছু দূরে এবং মূল শিকড় যতদূর নীচে গমন করা সম্ভব তাহা হইতে কিছু অধিক নীচ পর্য্যন্ত খনন করিয়া বিশেষ সতর্কতার সহিত চারাগুলি উঠাইতে হয়।

এক কালীন স্থায়ীস্থানে গাছ রোপণ করিতে হইলে, মনোনীত স্থানে আড়াই হাত ব্যাস এবং তিন হাত গভীর করিয়া গর্ত্ত খনন করিবে। পরে এক ভাগ দোআশমাটী ও দুই ভাগ গোময় সার একত্র মিশ্রিত করিয়া ঐ গর্ত্তের দুই হাত পরিমাণ স্থান পূর্ণ করিবে; তৎপর দোআঁশ মাটীর সহিত শিকি ভাগ পোড়ামাটী মিশাইয়া ঐ গর্ত্তের অবশিষ্টাংশ পূর্ণ করিবে; এবং তদুপরি পূর্ব্বোল্লিখিত প্রণালী মতে বক্র ভাগ উপরের দিকে রাখিয়া আঁটিটী রোপণ করিয়া দিবে। চারা উঠিলে

তাহাকে সতর্কতার সহিত রক্ষা করিবে। কেহ কেহ এই চারাগুলি দেড় কি দুই হাত উচ্চ হইলে বাঁশের ঘন বেড়া দ্বারা বেড়িয়া দিতে বলেন, তাহা মন্দ নয়। কারণ ইহা দ্বারা দুইটী উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে, এক ঐরূপে বেড়িয়া দিলে গাছগুলি সকালে বাড়িয়া উঠে, দ্বিতীয় গবাদি পশুর অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইয়া থাকে। বেড়া দিতে হইলে বাঁশ ছেঁচিয়া তদ্বারা চারার চারিদিক বেষ্টন করিয়া প্রাচীরের ন্যায় বেড়া গাঁথিয়া দিতে হইবে।

কলম করিবার প্রণালী।

সাধারণতঃ দুই প্রণালীতে আমের কলম হইয়া থাকে। এক গুল বা গুটি কলম; দ্বিতীয় যোড় কলম। বৃক্ষের শাখায় মৃত্তিকা সংযোগে যে কলম উৎপন্ন করা যায়, তাহাকে গুল বা গুটি কলম এবং চারার সহিত বৃক্ষের শাখা সংযোগ করিয়া যে কলম প্রস্তুত করা হয়, তাহাকে যোড় কলম বলা যায়।

কলম করিবার আবশ্যক হইলে শাখা নির্ব্বাচন করাই প্রথম কর্ত্তব্য। অধিক দিনের পুরাতন, নিস্তেজ ও রুগ্ন শাখা কলমের জন্য মনোনীত করা

কর্ত্তব্য নয়, কারণ ঐরূপ শাখায় গুটি কলম বান্ধিলে প্রায়ই শিকড় বাহির হয় না। বাহির হইলেও গাছ আশানুরূপ সুতেজ ও ফলবান্ হয় না। যোড় বান্ধিলেও অনেক স্থলে যোড় লাগে না। যোড় লাগিলেও গাছ নিস্তেজ, অল্পজীবী ও অল্প ফলপ্রদ হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ রূপ শাখা মনোনীত না করিয়া কলমের নিমিত্ত কনিষ্ঠাঙ্গুলি-প্রমাণ স্থূল অল্প বয়স্ক সুতেজ ও শক্ত শাখা, মনোনীত করিয়া লইবে। বৃক্ষের সর্ব্ব নিম্ন ভাগস্থ শাখা, নতমুখী শাখা এবং মধ্য ভাগস্থ ছায়া-যুক্ত শাখা গুলিতে ফল প্রায় ধরে না। এই নিমিত্ত ঐরূপ শাখায় কলম বান্ধিলে সে কল-মের গাছেও প্রায় ফল ধরিতে দেখা যায় না। সুতরাং ঐ প্রকার শাখা কলমের জন্য মনোনীত করা উচিত নয়। বৃক্ষের বহির্দ্দিগস্থ ঊর্দ্ধমুখী শাখা-গুলিই কলমের জন্য নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য। বিশে-ষতঃ সচরাচর যে সকল শাখায় অধিক সংখ্যক ফল ধরিয়া থাকে, কলমের জন্য সেই সকল শাখাই অধিক উপযোগী।

গুল বা গুটি কলম।

এই কলম করিতে হইলে, প্রথমতঃ পূর্ব্বোল্লিখিত মত একটী শাখা মনোনীত করিয়া লইবে। অনন্তর ঐ শাখার অগ্রভাগের কোমল অংশ ত্যাগ করিয়া তাহার পরে যে পর্ব্ব বা গাঁইট প্রাপ্ত হইবে, একখানা তীক্ষ্ণ ধার ছুরিকা দ্বারা ঐ পর্ব্বের অব্যবহিত নিম্নে শাখাটী বেষ্টন করিয়া একটী চক্রাকার দাগ দিবে, এবং ঐ দাগ হইতে তিন চারি অঙ্গুলি নীচে ঐ শাখাতে ঐ রূপ আর একটী দাগ দিবে। পরে ঐ উভয় দাগের মধ্যবর্ত্তী স্থানের ত্বক্ (ছাল) সাবধানতার সহিত এরূপ ভাবে উঠাইয়া ফেলিবে যে, কাষ্ঠে যেন অস্ত্রের আঘাত না লাগে; কারণ উদ্ভিদের ত্বক্ ও কাষ্ঠ এই উভয় অংশের মধ্যস্থানে কাষ্ঠ তন্তুর একটী কোমল স্তর থাকে, উহা দ্বারা রস আকর্ষিত হইয়া বৃক্ষের পরিপোষণ কার্য্য সম্পাদন করে। অস্ত্রাঘাতে উহা ছিন্ন হইয়া কি ত্বকের সহিত এককালীন উঠিয়া গেলে, রস সঞ্চারের ব্যাঘাত নিবন্ধন শাখাটী মরিয়া যাইতে পারে; এই নিমিত্ত যাহাতে ঐ কোমল

কাষ্ঠ তন্তুতে অস্ত্রের আঘাত না লাগে এরূপ সতর্কতার সহিত ত্বক্ উঠান কর্ত্তব্য। ত্বক্ উত্তোলিত হইলে ঐ ত্বক্-মুক্ত স্থান তৎক্ষণাৎ মৃত্তিকা দ্বারা ঢাকিয়া দিতে হইবে। এই মৃত্তিকা সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রকার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কেহ পত্রসারের, কেহ গোময় সারের এবং কেহ বা ক্ষুদ্র মৎস্য পচাইয়া সেই সারের সহিত এঁটেল মাটী মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিতে ব্যবস্থা করেন; কেহবা কেবল দোআঁশ মৃত্তিকা দ্বারাই কলম বান্ধিতে বলেন। উল্লিখিত সকল প্রকার মৃত্তিকাই কলম বান্ধার কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারে; তবে সার মৃত্তিকার বলাধিক্য বশতঃ উক্ত মৃত্তিকা দ্বারা কলম বান্ধিলে সকালে ফল পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু উহার একটী বৃহৎ দোষ এই যে জল না পাইলেই সার মিশ্রিত মৃত্তিকা শক্ত হইয়া যায়; এবং এরূপ কঠিন ভাবে শাখাকে আঁটিয়া ধরে যে, শিকড় গুলি আর বৃদ্ধি পাইতে পারে না এবং অচিরেই মরিয়া যায়; কিন্তু দোআঁশ মাটী দ্বারা কলম বান্ধিলে সে আশঙ্কা বড় থাকে না; কারণ ঐ মাটীর বান্ধা কলমে দুই চারি দিন জল না

দিলেও মাটী এরূপ শক্ত হয় না যে, তাহাতে কলমের কোন অনিষ্ট হইতে পারে। এই নিমিত্ত সার মাটীদ্বারা কলম বান্ধিলে, কলমে যাহাতে সতত জল পাইতে পারে বিশেষ সতর্কতার সহিত তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যেখানে জল দিবার সেরূপ বন্দবস্ত করিবার সম্ভাবনা না থাকে, সে খানে দোআঁশ মাটী দ্বারা কলম বান্ধাই কর্ত্তব্য।

কলমে ব্যবহারের মৃত্তিকা জল দ্বারা ছানিয়া এরূপ ভাবে প্রস্তুত করিবে যে, উহা আঠা আঠার ন্যায় হয়; অর্থাৎ নিতান্ত কঠিন বা একান্ত তরল না হয়; কলমে লাগাইলে যেন আট্‌কিয়া ধরিতে পারে। কলমের মাটী কলম কাটিবার পূর্ব্বেই প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়। কলম কাটা হইলে ঐ মাটীর একটী দলা লইয়া তাহা দুই ভাগ করিয়া দুই হাতে লইবে; পরে কাটা স্থানের দুই দিক হইতে উভয় হস্ত স্থিত মৃত্তিকা চাপা দিয়া এবং আঙ্গুল দ্বারা টিপিয়া উভয় মুখ জুড়িয়া এরূপ ভাবে আট্‌কাইয়া দিবে যে, কাটা স্থানটী যেন সম্পূর্ণ রূপে আবৃত হইয়া পড়ে। তৎপর উহার

উপরে ছেঁড়া চট কিম্বা নারিকেলের ছোব্ড়া জড়াইয়া তাহার উপর দড়ী পেচিয়া বান্ধিয়া দিবে। বাঁধা যেন বড় আঁটিয়া না যায়; কারণ আঁটিয়া বান্ধিলে কলমের মৃত্তিকা সরিয়া যাইতে পারে, এবং মৃত্তিকা ঐরূপ স্থান চ্যুত হইলে সেই মৃত্তিকা শূন্য ক্ষত স্থান হইতে রস নিঃসৃত হইয়া কলমের অনিষ্ট করিতে পারে। কলম বান্ধা হইলে তাহার এক হাত উপরে একটী ভাণ্ড (ভাঁড়) কিম্বা অন্য কোন পাত্র বান্ধিয়া, ঐ পাত্রের তলায় তিন চারিটী ছিদ্র করিয়া জল দিবার এরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিবে যে, ঐ পাত্র হইতে কলমের বান্ধা স্থানের উপর সতত ফোটা ফোটা করিয়া জল পতিত হয়। বর্ষাকালে কলমে জল দিবার ঐ প্রকার ব্যবস্থা না করিলেও বড় ক্ষতি হয় না; কারণ ঐ সময় বৃষ্টির জলই কলমে জলনিষেকের কার্য্য সম্পাদন করে। নিয়মিত রূপে জল পাইলে কিছুদিন মধ্যেই কলমের মাটী ও তদুপরি জড়িত চট বা নারিকেলের ছোব্ড়ার আবরণ ভেদ করিয়া সূতার ন্যায় শুভ্রবর্ণ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিকড় সকল বাহির হইয়া থাকে। সকল কলমেরই

যে ঠিক একই নির্দ্দিষ্ট সময়ে শিকড় বাহির হইবে, এমন কোন কথা নাই; তবে সাধারণতঃ দুই হইতে তিন মাসের মধ্যেই কলমে শিকড় বাহির হইয়া থাকে। শাখার প্রকৃতি ভেদে এবং অন্য নানাবিধ কারণে এই সময়ের অগ্রে বা পশ্চাতেও শিকড় বাহির হইতে পারে। কলম করিয়া শিকড় বাহির হইতে বিলম্ব হইল বলিয়া সহসা হতাশ হওয়া কর্ত্তব্য নয়; কারণ অনেক কলমের চারি পাঁচ মাসেও শিকড় বাহির হইতে দেখা গিয়াছে। কলমে প্রথম শিকড় বাহির হইলেই তাহাকে কাটিয়া আনিয়া রোপণ করা অনুচিত; কারণ প্রথম বারের শিকড়গুলি ভাবী বৃক্ষের জীবন রক্ষার তত উপযোগী হয় না। এই নিমিত্ত ঐ অবস্থায় কলম কাটিয়া আনিয়া লাগাইলে, তাহার অধিকাংশই মৃত্যু-মুখে নিপতিত হয়। প্রথম বার শিকড় বাহির হইবার পর কলম না কাটিলে, অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই ঐ শিকড়গুলি শুষ্ক হইয়া মরিয়া যায়। নিয়মিত রূপে জল পাইলে আবার কিছু দিন পরেই কলম হইতে পূর্ব্ববৎ নূতন শিকড় সকল বাহির হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় বার শিকড় বাহির হইলেই উহাকে কাটিয়া আনা উচিত। কলম কাটিবার সময় তাহাকে এক দিনেই কাটিয়া ফেলা কর্ত্তব্য নয়। কোন তীক্ষ্ণধার অস্ত্র দ্বারা ধীরতার সহিত গুলবান্ধা স্থানের নিম্নে দুই একদিন পর পর একটু একটু করিয়া কাটিয়া ছয়, সাত দিনে কাটার কার্য্য শেষ করিবে। কলম এইরূপে অল্পে অল্পে কাটিয়া আনিলে কাটার যাতনা ক্রমে তাহার সহ্য হইয়া আইসে, নতুবা হঠাৎ একদিনে কাটিয়া ফেলিলে কাটার কষ্ট একান্ত অসহনীয় হইয়া পড়ে, সুতরাং তাহার জীবনের আশা এককালেই নির্ম্মূল হইয়া যায়। যখন কিছু কিছু করিয়া কলম কাটিতে আরম্ভ করা যায়, তখন এক বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এই অবস্থায় অর্থাৎ কলম কতকটা কাটা হইলে যদি সহসা একটু বাতাস আসিয়া পড়ে, তাহা হইলেই শাখাটী ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে; এই নিমিত্ত যাহাতে ঐরূপে কলমের কোন অনিষ্ট না হয়, কলম কাটার পূর্ব্বেই তাহার কোনরূপ উপায় করিয়া পরে কলম কাটিতে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। একটী খুঁটা পুঁতিয়া তাহার সহিত কলম বান্ধিয়া

পরে কলম কাটিতে প্রবৃত্ত হইলে আর ঐ প্রকার অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে না। যদি কোন উচ্চ বৃক্ষের উচ্চশাখায় কলম বান্ধা হয়, তাহা হইলে কাটার সময় মাটিতে খুঁটা পুঁতিয়া তাহার সহিত কলম বান্ধা অসম্ভব হইয়া পড়ে; সুতরাং ঐরূপ অবস্থায় বিবেচনা পূর্ব্বক বৃক্ষের কোন বড় শাখার আশ্রয়ে দৃঢ়রূপে খুঁটা বান্ধিয়া পরে ঐ খুঁটার সহিত কলম বান্ধিয়া কাটার কার্য্য সম্পন্ন করা যাইতে পারে। কলম কাটিয়া আনিয়া একবারেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে রোপণ করা কর্ত্তব্য নয়। উহাকে প্রথমে হাপরে লাগাইতে হইবে। হাপর কোন স্থানে প্রস্তুত করিয়া কোন প্রকার আচ্ছাদন দ্বারা তাহাতে ছায়া করিয়া দিতে হইবে। হাপরে কলমের চারা সকল কিছু দূর দূর লাগান কর্ত্তব্য; কারণ চারাগুলি ঘন ঘন করিয়া লাগাইলে, পরে উঠাইয়া লাগাইবার সময় একটী উঠাইতে অন্যটীর শিকড় কাটিয়া তাহার অনিষ্ট সাধন করিতে পারে। হাপরের মাটী শুকাইয়া কঠিন হইতে দেওয়া উচিত নয়; অবস্থা বিবেচনায় তাহাতে সতত উপযুক্ত পরিমাণ জল দিতে হইবে। কলম হাপরে লাগাইবার সময়

উহাতে যে চট বা নারিকেলের ছোব্ড়া জড়ান থাকে, তাহা ধীরে ধীরে খুলিয়া দিবে। ঐ সময় উহার নবজাত শিকড়গুলি যাহাতে ছিঁড়িয়া না যায়, তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা গ্রহণ করিতে হইবে; কারণ ঐ শিকড়গুলিই ভাবী বৃক্ষের জীবন রক্ষার প্রধান অবলম্বন, সুতরাং তাহা ছিঁড়িয়া গেলে বৃক্ষের জীবন রক্ষার আর কোন আশা থাকে না। কলম লাগাইবার সময় আরও একটী বিষয়ে সতর্কতা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ঐ সময় উহার গোড়ার মৃত্তিকা খুব ঠাসিয়া দিতে হইবে; কারণ ঐ অবস্থায় যদি বাতাসে চারা লাড়িয়া ফেলে, তাহা হইলে বিশেষ অনিষ্ট সংঘটিত হইতে পারে। হাপরে কলমের চারা এক বৎসর কাল রাখিয়া পরে উপযুক্ত স্থানে লাগাইলেই ভাল হয়। চারার নিম্নে তৃণাদি জন্মিলে সময় সময় তাহা উঠাইয়া ফেলান কর্ত্তব্য। ১

যোড় কলম।

আম্রের চারার সহিত কোন আম্র বৃক্ষের শাখার সংযোগ করিয়া যে কলম করা হয়,

তাহাকে যোড় কলম বলা যায়। যোড় কলম বান্ধিতে হইলে প্রথমতঃ আঁটি পুঁতিয়া আম্রের চারা করিবে। চারার বয়স দুই কি তিন মাসের হইলেই তাহাকে মৃত্তিকা হইতে উঠাইয়া মূল শিকড়টী অবস্থা বিবেচনায় নিম্ন দিকে ছয় হইতে নয় ইঞ্চ পরিমাণ রাখিয়া অবশিষ্ট অংশ উপরের দিকে বাঁকাইয়া তুলিয়া দিবে এবং ঐ অবস্থায় পুনর্ব্বার মৃত্তিকায় লাগাইয়া রাখিবে। এইরূপ করিবার কারণ এই যে, যখন কলম বান্ধিবার জন্য চারা টবে উঠান হয়, তখন মূল শিকড় নিম্নভাগে নয় ইঞ্চের অধিক লম্বা থাকিলে, প্রায় অধিকাংশ চারাই মরিয়া যায়। চারা দুই বৎসর বয়স্ক হইলেই কলম বান্ধার উপযুক্ত হয়। কলম বান্ধার জন্য সতেজ চারা বাছিয়া লওয়া উচিত। কলম বান্ধিবার অন্ততঃ পনের দিবস পূর্ব্বে সতর্কতার সহিত চারা টবে উঠাইতে হয়। টবে চারা বাঁচিয়া গেলে, পরে যে গাছের যে ডালের সহিত কলম বান্ধিবে, তাহার পাশে একটী বাঁশের মাচা বান্ধিয়া তাহাতে, কি অন্য কোন উপায়ে টবটী এরূপভাবে স্থাপন করিবে যে, চারাও ডাল পর-

স্পর অনায়াসে একত্র করা যাইতে পারে। চারা যেরূপ স্থূল হইবে কলমের ডালও সেই পরিমাণ স্থূল ও সম্ভবতঃ সমবয়স্ক হওয়া উচিত; কারণ চারা ও ডালের স্থূলতার ও বয়সের সাম্যতা না থাকিলে অনেক স্থলে যোড় লাগার পক্ষে ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে। বিশেষতঃ চারার ও শাখার ত্বকের স্থূলতা যাহাতে পরস্পর সমান হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কলম বান্ধিলে সত্বর ফল পাইবার বিশেষ সম্ভাবনা। ডালের পাশে চারা স্থাপিত হইলে পর, এক খানা তীক্ষ্ণধার ছুরিকা দ্বারা ঐ ডাল ও চারা উভয়েরই তিন চারি অঙ্গুলি পরিমিত স্থানের স্থূলতার অর্দ্ধেক পরিমাণ চাঁচিয়া ফেলিবে। পরে ঐ ডাল ও চারার কর্ত্তিত স্থান পরস্পর সংযোগ করিয়া রসী দ্বারা পেচিয়া বান্ধিয়া দিবে। কেহ কেহ শুধুই রসী দ্বারা যোড় না বান্ধিয়া নিম্নলিখিত কোন এক প্রকার মসল্লা প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা যোড় বান্ধিতে পরামর্শ দিয়া থাকেন।

যোড় বান্ধার মসল্লা,—১ম, মেথী ।০ এক পোয়া, কর্ত্তিত পাট ।০ এক পোয়া, দোআঁশ

মাটী ।৴ এক পোয়া ও খৈল ।৴ এক পোয়া, এই চারি দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া যোড় স্থানে লাগাইয়া তদুপরি একখানা নেকৃড়া জড়াইয়া দিয়া তাহার উপর পাট পেচিয়া দিবে।

২য়,—গোময় ।৷৴ আধসের, তারপিন তৈল ।৴ এক পোয়া, ও টাট্‌কা মোম ।৴ এক পোয়া এই তিন দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ব্যবহার করিবে।

৩য়,—তারপিন, মোম, ধূনা ও ছাগের খাসির বসা সম পরিমাণ একত্রে অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া তাহা একখানা নেকৃড়ায় মাখাইয়া ঐ নেকৃড়াখানা যোড়স্থানে জড়াইয়া দিবে এবং তাহার উপর পাট পেচিয়া দিবে।

৪র্থ,—গোময়, চিক্কণ মৃত্তিকা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ত্তিত খড় একত্র করিয়া এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রহরে প্রহরে তাহাতে জল দিয়া মর্দ্দন করিবে। সপ্তাহ অন্তে উহা প্রথম প্রকরণের লিখিত মত যোড়-স্থানে ব্যবহার করিবে এবং তাহার উপর পাট পেচিয়া দিবে।

যোড়বান্ধার পর পনের দিন হইতে তিন মাসের মধ্যে যোড় লাগিয়া কলম প্রস্তুত হইয়া থাকে। কলম কাটিয়া আনিবার অন্ততঃ একমাস পূর্ব্বে যেস্থানে যোড়বান্ধা যায়, তাহার দুই অঙ্গুলি উপরে চারার মস্তক কাটিয়া ফেলিবে। এইরূপ করিবার কারণ এই যে, যে রস উপরে উঠিয়া চারার মস্তকের পরিপোষণ কার্য্য সম্পাদন করিত, চারার মস্তক কর্ত্তিত হওয়ায়, সেই রস তখন কলমের শাখায় প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে পরিপুষ্ট করিতে থাকিবে এবং চারা ও শাখা এক অঙ্গের ন্যায় হইয়া অল্প সময়ের মধ্যে সতেজ হইয়া উঠিবে। অবশেষে যোড় স্থানের দুই তিন অঙ্গুলি নিম্নে ডাল কাটিয়া কলম নামাইয়া আনিবে।

যোড় কলম সকল ঋতুতেই হইতে পারে, তবে বর্ষাকালে করিলেই ভাল হয়। অন্য ঋতুতে করিতে হইলে প্রায় প্রতিদিনই টবস্থ চারার মূলে জল দিতে হয়; কারণ চারার মূলের মৃত্তিকা শুষ্ক হইয়া গেলে অনেক সময় চারা মরিয়া সমস্ত যত্নই বিফল হইতে পারে। চারা মরিয়া না গেলেও তন্মূলস্থ মৃত্তিকার নীরসতা নিবন্ধন চারায় উপযুক্ত

রস সঞ্চারিত হইতে না পারায়, যোড় লাগার পক্ষে সম্পূর্ণ ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে। এই অবস্থায় কেহ কেহ চারার মূলে এবং যে গাছের শাখায় কলম বান্ধা হয়, সেই গাছের মূলেও জল সেচন করিতে পরামর্শ দিয়া থাকেন।

গাছ হইতে কলম নামাইয়া আনিয়া পনের কি বিশ দিন পর্য্যন্ত টবশুদ্ধ ঐ কলম কোন শীতল স্থানে রাখিয়া দিবে। পরে টব ভাঙ্গিয়া কলম-টীকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে লাগাইয়া দিবে। যোড় কলম রোপণ করিবার সময় যোড়টীর তিনভাগের দুই ভাগ মৃত্তিকার নীচে ও একভাগ উপরে রাখিয়া রোপণ করিবে; কারণ যোড়টীর সমুদায় অংশ উপরে রাখিয়া রোপণ করিলে অনেক সময় বাতাসে এই যত্নকৃত সংযোগটী দ্বিধা বিভক্ত করিয়া কলমের জীবন বিনাশ করিতে পারে; আবার সমুদায় অংশ মৃত্তিকার নীচে প্রোথিত করিয়া দিলে যোড়ের চারার ঊর্দ্ধভাগের কর্ত্তিত স্থান হইতে পচিতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে মূল পর্য্যন্ত পচিয়া কলমের জীবন বিনষ্ট করিতে পারে; এই নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অবলম্বন করাই বিধেয়।

চারা রোপণ করার পর দশ পনের দিবস পর্য্যন্ত তাহার উপরে ছায়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

কেহ কেহ বলেন যোড় কলমের আম ঠিক মূল গাছের আমের অনুরূপ হইতে পারে না; কারণ নিকৃষ্ট আমের চারার সহিত সংযুক্ত হইয়া উহার উৎপত্তি হয়; সুতরাং কলমের মূল ভাগ নিকৃষ্ট আমেরই থাকিয়া যায়; কেবল শাখা প্রশাখাগুলি উৎকৃষ্ট আমের হইয়া থাকে; এ অবস্থায় মূলের দোষে কলমের আম বিকৃত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, কিন্তু বিজ্ঞানবিদ্ বহুব্যক্তি দ্বারা পরীক্ষিত ও স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, এমত নিতান্ত ভ্রান্তি সঙ্কুল। আমরাও পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, যোড় কলমের গাছের ফল ও ফুল ঠিক মূল গাছের অনুরূপ হইয়া থাকে। আমাদের বিবেচনায় কলম করিতে হইলে অধিকাংশ স্থলে গুটি কলম না করিয়া যোড় কলম করাই উচিত, কারণ গুটি কলম বান্ধিলে শতকরা পঞ্চাশটী কলম হয় কি না সন্দেহ স্থল, কিন্তু যোড় কলম শতকরা প্রায় নব্বইটী হইয়া থাকে। যেহেতু প্রথমটী জটিল, দ্বিতীয়টী সহজ। বিশেষতঃ কোন

স্থান হইতে দূরদেশে কলম পাঠাইবার জন্য যোড় কলমই উৎকৃষ্ট, কারণ গুটি কলমের মূল শিকড় হয় না, কৃত্রিম উপায়-জাত কতকগুলি উপ-শিকড়ই উহার জীবন রক্ষার প্রধান অবলম্বন; সুতরাং ঐ শিথিল-মূল গুটি কলম সকল অতি সহজেই নড়িয়া যাইতে পারে ও ঐরূপ নড়ায় কলম-গুলির নবজাত উপশিকড় সমূহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া উহাদের জীবন বিনাশ করিতে পারে; কিন্তু যোড় কলমের মূল শিকড় থাকায় তাহার সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই।

আম্র বাগান।

যেস্থানের মৃত্তিকা কিঞ্চিদধিক এঁঠেল মিশ্রিত দোআঁশ ও অপেক্ষাকৃত উচ্চ, আম্রবাগানের নিমিত্ত সেইরূপ স্থান মনোনীত করা কর্ত্তব্য। স্থান নির্ব্বাচিত হইলে তাহার বন জঙ্গলাদি কাটিয়া স্থানটী পরিস্কার করিয়া নিবে, তৎপর যতদূর সম্ভব গভীর করিয়া সমস্ত জমিতে কোদালী করিবে অথবা লাঙ্গল দ্বারা চাস করিবে। সমুদায় জমিতে কোদালী অথবা চাস করা শেষ হইলে বাগানের

চতুর্দ্দিকে দুই কি আড়াই হাত গভীর পরিখা অর্থাৎ জুলী খনন করিয়া ঐ জুলীর মৃত্তিকা সমস্ত বাগানে ছড়াইয়া দিবে। পরে জমিতে পুনর্ব্বার কোদালী অথবা চাস করিয়া ডেলা ভাঙ্গিয়া সমস্ত জমি উত্তম রূপে পাইট করিয়া নিবে। জমি এরূপ সমতল করিতে হইবে যে, ঐ জমি মধ্যে কোথাও জল টিকিতে না পারে। জমি প্রস্তুত হইলে পরস্পর বিশ হাত (১) ব্যবধান রাখিয়া সমস্ত জমি মধ্যে শ্রেণীপূর্ব্বক ঠিক সমসূত্রপাতে তিন হাত গভীর এবং আড়াই হাত ব্যাস পরিমাণ, সারি সারি গর্ত্ত করিবে। পরে ঐ সকল গর্ত্তের তিন ভাগের দুই ভাগ পর্য্যন্ত দুই ভাগ গোময় সার ও এক ভাগ দোআঁশ মৃত্তিকা একত্র মিশ্রিত করিয়া তদ্বারা পূর্ণ করিবে। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে নূতন বাগানের ভূমি এই প্রকারে প্রস্তুত করিয়া রাখিবে এবং সমস্ত বর্ষাকাল উহার উপর দিয়া জল বহিতে দিবে। কার্ত্তিক মাসে ঐ বাগানের প্রত্যেক গর্ত্তে

---

(১) মহর্ষি পরাশর তাঁহার "কৃষি পরাশর" গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"উত্তমং বিংশতির্হস্তা, মধ্যমং ষোড়শান্তরম্।

স্থানাৎ স্থানান্তরং কার্য্যং বৃক্ষাণাং দ্বাদশান্তরম॥"

এক একটী চারা অথবা কলম রোপণ করিয়া গর্ত্তের অবশিষ্টাংশ দোআঁশ মৃত্তিকা দ্বারা পূরণ করিয়া দিবে। আমাদের দেশে অনেকে বর্ষা-কালে চারা রোপণ করিয়া থাকেন; কিন্তু তাহা নিতান্ত অনুচিত; কারণ বর্ষাকালে রোপিত চারার মূলস্থ মৃত্তিকা বৃষ্টির জলে শিথিল হইয়া পড়ে, তাহাতে অনেক সময় অল্প বাতাসেই চারাগুলি হেলিয়া মাটীতে পড়িয়া যায়। বিশেষতঃ মূলস্থ মৃত্তিকা নিয়ত শিথিল থাকায় চারাটী মৃত্তিকার উপর জোর করিয়া ঠিক সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে না। অনেক স্থলে চারার কোমল শিকড় গুলি অবিশ্রান্ত বর্ষার জলে পচিয়া যায়; এবং তাহাতেই চারার জীবনান্ত হয়। বর্ষাকালে রোপিত চারার পক্ষে এই প্রকার নানা বিঘ্ন উপ-স্থিত হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত চারা সকল কার্ত্তিক মাসে রোপণ করাই বিধেয়। আবশ্যক হইলে কার্ত্তিক হইতে বসন্তের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত চারা সকল রোপণ করা যাইতে পারে।

চারা রোপিত হইলে গাছের গোড়ায় জল রক্ষার নিমিত্ত মৃত্তিকা দ্বারা চতুর্দ্দিকে বলয়াকারে

আলি বন্ধন করিয়া দিবে। কার্ত্তিক হইতে বর্ষা-সমাগম পর্য্যন্ত ঐ সকল চারায় জল সেচন করিতে হয়। আর্য্যশাস্ত্রকারগণ বলেন গ্রীষ্মকালে প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় শীতকালে কেবল সন্ধ্যাবেলায় এবং বর্ষাকালে মৃত্তিকা শুষ্ক হইলে রোপিত বৃক্ষ সকলে জল সিঞ্চন করিবে। (১) এটী অতি সুন্দর বিধি। এই অনুসারে রোপিত চারা সকলে জল দান করিলে বিশেষ ফল লাভের সম্ভাবনা আছে। চারা রোপণ করিবার পর তাহাতে তিন চারি বৎসর পর্য্যন্ত এই নিয়মে জল প্রদান করিতে হয়। চারা লাগান হইলে ছেঁচা বাঁশের ঘন ঘেরা দ্বারা প্রত্যেকটী চারা ঘেরিয়া দিতে হয়। এই প্রকার ঘেরিয়া দিলে চারাগুলি প্রখর সূর্য্যোত্তাপ হইতে রক্ষিত হয় এবং শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠে। অধিকন্তু গো ছাগল প্রভৃতির অত্যাচার হইতেও রক্ষা পাইয়া থাকে। চারার গোড়ার মৃত্তিকা শক্ত হইয়া গেলে সময় সময় তাহা খুঁড়িয়া মাটী গুলি

---

(১) সায়ং প্রাতস্তু ঘর্ম্মান্তে, শীতকালে দিনান্তরে।
বর্ষাতৌ তু ভুবঃ শোষে, সেক্তব্যা রোপিতা দ্রুমাঃ॥
ইতি কৃষি পরাশরঃ।

আল্‌গা করিয়া ও বন জঙ্গলাদি হইলে তাহা পরিস্কার করিয়া দিতে হয়। চারা লাগাইবার পর বৎসর হইতে প্রতিবৎসর কার্ত্তিক মাসে সমস্তটী বাগান একবার কোদালী করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। গাছ চারি পাঁচ বৎসর বয়স্ক ও বেশ সুতেজ হইলে প্রতিবৎসর বর্ষারম্ভের পূর্ব্বে সমস্ত গাছের গোড়ায় বর্ষার জল রক্ষার নিমিত্ত কতকটা খুঁড়িয়া গর্ত্ত করিয়া ও চতুষ্পার্শ্বে আলি বন্ধন করিয়া দিবে। পরে কার্ত্তিক মাসে এক ভাগ গোময়সার অথবা খৈলসার এবং দুই ভাগ দোআঁশ মৃত্তিকা একত্র মিশ্রিত করিয়া তদ্বারা ঐ সকল গর্ত্ত পূর্ণ করিবে এবং তদুপরি আলি বন্ধনের মৃত্তিকা ভাঙ্গিয়া দিয়া ঢিপির মত বান্ধিয়া দিবে। ইহা দ্বারা বৃক্ষমূলের উষ্ণতা রক্ষিত হইয়া থাকে। হেমন্ত ও শিশির কালে এই প্রকারে বৃক্ষমূলের উষ্ণতা রক্ষা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য; নচেৎ বৃক্ষে উপযুক্ত মত ফল ধরে না। বৃক্ষে ফল ধরিতে আরম্ভ করিলে প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাসে বৃক্ষের অকর্ম্মণ্য শাখাগুলি ছেদন করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, কারণ ঐ শাখাগুলি বৃক্ষের ফল বৃদ্ধির নিতান্ত অন্তরায়। বিশে-

ষতঃ ঘন-পল্লব-সমাচ্ছন্ন বৃক্ষে ফলের সংখ্যা নিতান্তই কম হয়। এই নিমিত্ত বৃক্ষের ডাল পালা অত্যন্ত ঘন হইলে তাহার কতকগুলি শাখা প্রশাখা ছেদন করিয়া বিরল করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। যে বৎসর বৃক্ষের শাখা ছেদন করা যায়, সে বৎসর যদিও ফলের সংখ্যা কম হয়, কিন্তু তৎপরবৎসর ঐ গাছে ফল অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, বৃক্ষে এক বৎসর ফলের সংখ্যা অধিক ও এক বৎসর অল্প হয়; এইরূপ অল্প ফল ধরার বৎসরেই বৃক্ষের শাখা প্রশাখা ছেদন করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

অনেক কলমের চারায় প্রথম বর্ষেই মুকুল আসিয়া থাকে। প্রথম বর্ষে মুকুল আসিলে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলান কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় বর্ষে মুকুল আসিলে তাহাতে ছোট ছোট ফল ধরিবা মাত্র ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। তৃতীয় বর্ষে মুকুল আসিলে ফল কিছু বড় হইলে কতকগুলি ভাঙ্গিয়া দিবে, অবশিষ্টগুলি ফলের ডাঁশাল অবস্থায় ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। চতুর্থ বর্ষ হইতে আম সুপক্ক হওয়া পর্য্যন্ত রক্ষা করা যাইতে পারে; কিন্তু গাছ

সুতেজ ও বড় না হওয়া পর্য্যন্ত গাছে অতিরিক্ত মুকুল আসিলে তাহার কতকটা ভাঙ্গিয়া ফেলান কর্ত্তব্য, নতুবা ফল আকারে অনেক ক্ষুদ্র এবং বৃক্ষটীও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। মুকুলের সময় আকাশে অত্যন্ত কুয়াশা হইলে সমস্ত মুকুল শুকাইয়া যাইবার সম্ভাবনা, সুতরাং ঐ রূপ হইলে গাছের মূলে জল সিঞ্চন করিয়া তাহা শীতল রাখা কর্ত্তব্য।

আম্র হইবার সময়।

বঙ্গদেশের অধিকাংশ স্থানেই পৌষ মাসে আম্রের মুকুল বাহির হইতে আরম্ভ হয়, এবং মাঘ মাসে কোন গাছের মুকুল বাহির হইতে প্রায় বাঁকি থাকে না। মুকুলের সময় অধিক বৃষ্টি হইলে বীজকোষ নষ্ট হইয়া আম্র জন্মিবার ব্যাঘাত জন্মাইয়া থাকে। ফাল্গুন মাসের শেষভাগে মুকুলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফল ধরে; উহাকে কোথাও বা কড়া কোথাও বা কড়েয়া এবং কোথাও বা গুটি বলে। বৈশাখ মাস হইতেই আম্র পাকিতে আরম্ভ হয় এবং জৈষ্ঠ মাসের শেষ পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত আম

পাকিয়া যায়। কিন্তু মালদহ, ভাগলপুর এবং ভারতের উত্তর পশ্চিম ও বোম্বে প্রভৃতি দক্ষিণ অঞ্চলে ফাল্গুন মাসে আম্রের মুকুল নির্গত হইতে আরম্ভ হয়; এবং আষাঢ় মাস হইতে আম্র পাকিতে আরম্ভ করে। ঐ সকল স্থানের আম্র ব্যবসায়ীগণ যত্ন করিয়া রাখিয়া ভাদ্র মাসের শেষ পর্য্যন্ত আম্র বিক্রয় করিয়া থাকে।

আম্রে কীট।

আম্রে এক্ষণে দ্বিবিধ কীটের উৎপাত আরম্ভ হইয়াছে। এক বৃক্ষে, অপর ফলে। বৃক্ষের কোন শাখায় কীট লাগিলে, ঐ শাখা হইতে করাতের গুঁড়ার মত এক প্রকার পদার্থ পড়িতে থাকে, অনুসন্ধান করিলে ঐ শাখায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র দৃষ্ট হয়। শাখাটী ক্রমে নিস্তেজ হইয়া আইসে ও পরে এককালীন শুষ্ক হইয়া মরিয়া যায়। ঐরূপ কীট বিনষ্ট শাখা অতি সামান্য বাতাসেই ভাঙ্গিয়া পড়ে। অল্প বয়স্ক গাছে কীট লাগিলে তাহার আর প্রায় জীবনের আশা থাকে না। অধিক বয়স্ক গাছে কীট প্রবিষ্ট হইলে তাহারও প্রচুর

ক্ষতি করিয়া থাকে। প্রথমতঃ পূর্ব্ব বঙ্গের আম্র-বৃক্ষ সকলে এই কীট দেখা দেয়, এক্ষণে বাঙ্গালার অধিকাংশ স্থানেই ইহা ব্যাপিত হইয়া পড়িয়াছে। কি কারণে ও কি উপায়ে যে এই কীটের উৎপত্তি হয়, এবং কি প্রণালী অবলম্বন করিলেই বা ইহার উৎপাত হইতে বৃক্ষ গুলিকে রক্ষা করা যাইতে পারে, তাহা আজিও স্থিরীকৃত হয় নাই। তবে এ সম্বন্ধে অনেকেই অনেক মত বলিয়া থাকেন, আমারাও বাধ্য হইয়া ব্যবসায়ী ও কৃষিতত্ত্ব পত্রিকা হইতে কয়েকটী মত অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পাঠকগণ আবশ্যক বোধ করিলে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। ১২৯৩ বঙ্গাব্দের ৩য়, ভাগ ব্যবসায়ীর ৫ম, ও ৬ষ্ঠ, সংখ্যায় লিখিত হইয়াছে যেঃ—

"গাছে পোকা লাগিয়াছে জানিতে পারিলে যে যে স্থানে করাতের গুঁড়ার মত পদার্থ ও ছিদ্র পাওয়া যায়, সেই সেই স্থানে হিং ও তামাক পাতার জল সিদ্ধ করিয়া ঐ জল পিচ্‌কারী দিয়া অথবা মাখাইয়া দিবে। এক সের তামাক পাতা, আধ পোয়া হিং পাঁচ সের জলে সিদ্ধ করিতে হয়, ইহা দ্বারা পোকার উপদ্রব অনেক পরিমাণে দূর

হইবার কথা। কোন গাছে পোকা ধরিলে যদি কোন উপায়ে তাহা নিবারিত না হয়, অন্যান্য গাছ নিরাপদ করিবার জন্য ঐ গাছ সমূলে নষ্ট করা উচিত।”

৪র্থ খণ্ড কৃষিতত্ত্বের ৮ম, সংখ্যায় বাবু শিব নারায়ণ নায়ক ঐ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে “গাছের গোড়ার মৃত্তিকা অর্দ্ধ হস্ত হইতে এক হস্ত পর্য্যন্ত খুঁড়িয়া তাহার আস্থানিক সরু শিকড় কাটিয়া দিবেন, (এক বা অর্দ্ধ হস্তের মধ্যে যত পাওয়া যায়) সেই শিকড় সামান্য তৃণের ন্যায় পাতলা যেন হয়, মোটা শিকড় কাটিবেন না। পরে ধান্য-ক্ষেত্র হইতে মৃত্তিকা আনিয়া তিলের খৈল ১ ভাগ ও মৃত্তিকা ৩ ভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া দুই দিবস রৌদ্রে ও শিশিরে দিয়া তাহার পর সেই মৃত্তিকাতে পচা পুঁঠিমাছ এবং পুরাতন ইষ্টকের চূর্ণ ও শঙ্খ আলুর বীচি কিছু চূর্ণ করিয়া পূর্ব্বের মৃত্তিকায় মিশাইয়া এক দিন রৌদ্র ও হীমে শুষ্ক করিয়া গর্ত্ত পূর্ণ করিবে। (সেই গর্ত্ত দুই দিনের অধিক আল্‌গা রাখা উচিত নহে) পরে সেই গর্ত্তে মাদা বান্ধিয়া প্রত্যেক গাছের গোড়ায় /১ সের ভেরে-

গুার খৈল দিয়া জল দিবে, ইহাতে যদি পোকা সম্পূর্ণ নষ্ট না হইয়া বৃক্ষ সতেজ না হয় তবে সেই ভেরাণ্ডা রান্ধিয়া এদেশে যে তৈল বাহির করে সেই তৈল উক্ত ক্ষত স্থানে দিনে দুইবার প্রদান করিবে এবং একটী হাঁড়িতে সেই জল রাখিয়া গাছের গোড়ায় অথবা যে যে স্থানে পোকা লাগিবার সম্ভব সেই ডালের নীচে বসাইয়া দিলে সেই পোকা হয় সে ডাল হইতে চলিয়া যাইবে নচেৎ সেই জল পূর্ণ হাঁড়িতে আসিয়া মরিবে, ইহাতে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে।

আমাদের ইহা পরীক্ষিত ঔষধ, অতএব এ বিষয়ে অধিক কিছু করিতে হইবে না, এক সপ্তাহ মধ্যে ভাল মন্দ জানিতে পারিবেন।"

ঐ সংখ্যক কৃষিতত্ত্বে আম্রগাছে পোকা লাগা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বাবু বেণীমাধব বসু লিখিয়াছেন যে, "আমার যে সকল উৎকৃষ্ট আম্রের গাছ আছে তন্মধ্যে একটী গাছে পোকা লাগিয়া অল্প দিনের মধ্যে গাছটী মারিয়া ফেলে। অসময়ে বৃক্ষটী নষ্ট হওয়ায় আমি বিশেষরূপ দুঃখিত হই এবং তদবধি আম্রগাছের ঐ পোকা নষ্ট করিবার জন্য

নানা প্রকার ঔষধ অনুসন্ধান করি। এই ঘটনার পাঁচ ছয় মাস পরে দেখি আর একটী গাছে ঐ প্রকার কীট লাগিয়াছে। কীটে গাছের কিয়দংশ কুরিয়া খাইয়া ফেলিয়াছে। এবং ঐ ক্ষত স্থান হইতে এক প্রকার আঠা নির্গত হইতেছে। গাছের অবস্থা দেখিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম, এবং সর্ব্বদা ভাবিতে লাগিলাম কি প্রকারে ঐ গাছটী রক্ষা করি। অনন্তর একখানি ছুরি দ্বারা গাছের ক্ষত অংশ উত্তম করিয়া চাঁচিয়া পরিষ্কার করিলাম। ক্ষত স্থান পরিষ্কার হইলে তাহাতে আলকাতরা লাগাইয়া দিলাম। কিছুদিন পরে দেখি ঐ সকল পোকা আর নাই এবং গাছেও আর আঠা পড়িতেছে না। কিন্তু ইহাতেও সন্দেহ গেল না; আশঙ্কা বশতঃ পুনর্ব্বার উহাতে পূর্ব্বের ন্যায় আলকাতরা লেপিয়া দিলাম। দ্বিতীয়বার আলকাতরা দেওয়ার পর কীটের আর কোন চিহ্ন দেখা যায় নাই। বৃক্ষ দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে এবং সেই গাছে প্রচুর আম্র ফলিয়াছে। এই সকল আম্রের আস্বাদনের কোনরূপ বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না। আমার এই বিশেষ অনুরোধ যাঁহাদিগের আম্রগাছে

ঐরূপ পোকা লাগিয়াছে, তাঁহারা যেন একবার ক্ষত স্থানে আলকাতরা দিয়া চেষ্টা করিয়া দেখেন যে এই ঔষধটী কতদূর উপকারী।”

আম্রগাছের যে ডালে পোকা লাগে তাহা ভাঙ্গিয়া দূরে নিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। ইহাতেও গাছে পোকার অনিষ্টকারিতা অনেক পরিমাণে কমিতে পারে। পোকা লাগা ডাল ভাঙ্গিয়া গাছের নীচে কি বাগানের কোন স্থানে ফেলাইয়া রাখিলে, সেই অন্তঃসার বিহীন ডালের অভ্যন্তরস্থ পোকা, ডাল হইতে বাহির হইয়া সেই গাছের অন্য শাখায়, অথবা অপর কোন গাছের শাখায় প্রবিষ্ট হইয়া তাহারও বিনাশ সাধন করিতে পারে। এই নিমিত্ত পোকা ধরা ডাল দূরে পোড়াইয়া ফেলা কর্ত্তব্য।

পোকা লাগিলে সতর্ক হওয়া অপেক্ষা যাহাতে পোকা লাগিতে না পারে তদ্বিষয়ে সতর্কতা গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক। সাধারণতঃ আর্দ্র স্থানে গাছ রোপণ করিলে, গাছের গোড়ায় টাট্‌কা সার দিলে কিম্বা অত্যন্ত বন জঙ্গল হইলে গাছে পোকা ধরিতে পারে; সুতরাং যাহাতে তদ্রূপ হইতে না

পারে সে বিষয়ে সকলেরই সতর্কতা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। আমরা দেখিয়াছি, যে আম্র বাগানের সমস্ত মৃত্তিকা বৎসরের মধ্যে দুই তিনবার লাঙ্গল দ্বারা চাষ করিয়া তাহার বন জঙ্গল বাছিয়া ফেলান হইয়াছে, সেই বৎসর ঐ বাগানের গাছে পোকার উপদ্রব প্রায় হয় নাই। গাছগুলিকে পোকার উপদ্রব হইতে রক্ষা করিবার পক্ষে ইহাও একটী উৎকৃষ্ট উপায়।

আমের গাছে পোকা লাগিলে তাহা নিবারণের কতকটা উপায় করার আশা করা যাইতে পারে, কিন্তু আমের মধ্যে যে পোকা হয়, তাহা নিবারণের কোনই উপায় দেখা যায় না। আমে দুই প্রকার পোকা হইয়া থাকে। এক প্রকার কোমল, ঈষদ্ লম্বাকৃতি, শ্বেত বর্ণ ও ক্ষুদ্রকায় বিশিষ্ট। সাধারণতঃ আঘাৎ প্রাপ্ত আম্র গুলিতেই এই প্রকার পোকা হইতে দেখা যায়; আবার কোন গাছের প্রায় সমুদায় আম্রেই এই প্রকার পোকা হইতে দেখা গিয়াছে। এই পোকা যে আম্রে হয়, তাহা ভক্ষণের এক কালীন অযোগ্য হইয়া থাকে। কলিকাতার দক্ষিণ অঞ্চলে, এবং যশোহর, পাবনা,

ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও আসাম প্রদেশে আম্রে এক প্রকার পোকা হয়, সে গুলির গাত্র কর্কশ ও অপেক্ষাকৃত কঠিন আবরণে আবৃত, মুখ হস্তী শুণ্ডের ন্যায় শুণ্ডযুক্ত, বর্ণ কপিশ এবং পা ছয়টী। এই পোকা গুলির পাখা আছে সুতরাং উড়িতে পারে। আম্রের অাঁটির আবরণ শক্ত হইবার পূর্ব্বে উহাতে পোকার কোন চিহ্ন দেখা যায় না। আম্রের ডাঁশাল অবস্থা হইতেই উহাতে পোকার জন্ম হইয়া থাকে। সুপক্কাবস্থায় কোন কোন আম্রের গাত্রে পোকার ছিদ্র দেখা যায় বটে, কিন্তু অধিকাংশ আম্রের গাত্রেই কোন চিহ্ন দেখা যায় না। অথচ উহাদের মধ্যে কি প্রকারে উড়নশীল পোকা জন্মগ্রহণ করিল, তাহা ভাবিয়া স্থির করা সুকঠিন। অনেকে বলেন মুকুল অবস্থায় এই পোকার বীজ উহাতে আশ্রয় গ্রহণ করে, কিন্তু তাহা কত দূর সত্য ঠিক বলা যায় না। এই পোকার উৎপাত হইতে আম্রগুলিকে রক্ষা করিবার কোন উৎকৃষ্ট উপায় অর্জিও আবিষ্কৃত হয় নাই; তবে ঐ সম্বন্ধে অনেকে অনেক মত বলিয়া থাকেন বটে, কিন্তু

তাহার একটীও কার্য্যকরী বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না।

আম্রের গুণ।

আর্য্যশাস্ত্রকারগণ আম্রের যে সকল গুণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার কতকগুলি নিম্নে লিখিত হইল যথা ঃ—

মহামতি ভাব মিশ্র স্বীয় ভাব প্রকাশ গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

আম্রপুষ্পমতীসার কফপিত্তপ্রমেহনুৎ।
অসৃগ্‌দুষ্টিহরং শীতং রুচিকৃদ্‌গ্রাহি বাতলম্‌॥
আম্রংবালং কষায়াম্লং রুচ্যং মারুত পিত্তহৃৎ।
তরুণস্তুতদত্যম্লং রুক্ষং দোষ ত্রয়াস্রজিৎ॥
আম্র মামংত্বচাহীন মাতপেহতি বিশোষিতম্‌।
অম্লং স্বাদু কষায়ং স্যাদ্ভেদনং কফবাতজিৎ॥
পক্বন্তু মধুরং বৃষ্যং স্নিগ্ধং বল সুখ প্রদম্‌।
গুরুবাতহরং হৃদ্যং বর্ণ্যং শীতম পিত্তলম্‌।
কষায়ানুরসং বহ্নি শ্লেষ্ম শুক্র বিবর্দ্ধনম্‌॥
তদেব বৃক্ষ সম্পক্বং গুরুবাতহরং পরম্‌।
মধুরাম্লরসং কিঞ্চিদ্ভবেৎ পিত্তপ্রকোপনম্‌॥

আম্রং কৃত্রিম পক্বং যৎ তদ্ভবেৎ পিত্তনাশনম্।
রসস্যাম্লস্য হীনত্ত্ব মাধুর্য্যাচ্চ বিশেষতঃ॥
উষিতং তৎপরংরুচ্যং বলবীর্য্যকরংলঘু।
শীতলং শীঘ্র পাকিস্যাদ্বাতপিত্তহরং পরম্॥
তদ্রসো গালিতো বল্যো গুরুর্ব্বাত হরঃসরঃ।
অহৃদ্য স্তর্পণোহতীব বৃংহণঃ কফ বর্দ্ধনঃ॥
তস্য খণ্ডং গুরুপরং রোচনং চির পাকিচ।
মধুরং বৃংহণং বল্যং শীতলং বাত নাশনম্।
বাতপিত্তহরং রুচ্যং বৃংহণং বল বর্দ্ধনম্।
বৃষ্যং বর্ণকরং স্বাদু দুগ্ধাম্রং গুরু শীতলম্॥
মন্দানলত্বং বিষমজ্বরঞ্চরক্তাময়ংবদ্ধগুদোদরঞ্চ।
আম্রাতিযোগো নয়নাময়ং বা, করোতি তস্যা-
দতিতানি নাদ্যাৎ॥

এতদম্লাম্র বিষয়ং মধুরাম্ল পরং নতু।
মধুরস্য পরং নেত্র হিতত্বাদ্যা গুণাযতঃ।
শুণ্ঠ্যাম্ভসোনুপানং স্যাদাম্রানামতি ভক্ষণে।
জীরকংবা প্রযোক্তব্যং সহ সৌবর্চ্চলে নচ॥”

অম্রের পুষ্প অতিসার কফ পিত্ত ও প্রমেহ-নাশক, রক্ত দোষ অপহারক, শীতল, রুচিকর, ধারক এবং বায়ুবর্দ্ধক। কচি আম কষায়, অম্লরস

বিশিষ্ট, রুচিকর, বায়ু ও পিত্তনাশক। তরুণ আম্র (কাঁচা আম) অত্যন্ত অম্ল, রুক্ষ, ত্রিদোষ নাশক ও রক্ত বিশোধক। সূর্য্যোত্তাপে অত্যন্ত শুষ্ক ত্বক্ বিহীন কাঁচা আম অম্ল, স্বাদু, কষায় রস-বিশিষ্ট, ভেদক ও কফ বায়ু শান্তিকারক। পাকা আম মধুররসযুক্ত, পুষ্টিকারক, স্নিগ্ধ, বলবর্দ্ধক, সুখদায়ক, গুরুপক্ক, বাত নাশক, হৃদ্য (হৃদয়ের প্রিয়) বর্ণকারক, শীতল, অপিত্তল (পিত্তবর্দ্ধক নয়) কষায়রস বিশিষ্ট, অগ্নি, কফ ও শুক্রবর্দ্ধক। গাছে পাকা আম গুরুপাক, বায়ু নাশক, কিঞ্চিদম্ল মধুররসযুক্ত ও পিত্ত প্রকোপজনক। কৃত্রিম উপায়ে পাকা আম পিত্ত নাশক এবং অম্ল বিশে-ষতঃ মধুর রসবিহীন। বাসি আম রুচিকর ও বলবীর্য্য কারক, লঘু, শীতল, শীঘ্রপাকী এবং বাতপিত্ত বিনাশক। আমের গালিত রস বলবর্দ্ধক, গুরুপাক, বায়ু নাশক ও শুক্রাদির প্রবর্ত্তক, অহৃদ্য, অতিশয় তৃপ্তিকারক এবং শুক্র ও কফ বর্দ্ধক। আম্রখণ্ড গুরু, রুচিকারক, চিরপাকী, মধুর রস-যুক্ত, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, শীতল ও বাতনাশক। দুগ্ধাম্র বায়ু পিত্ত নাশক, রুচিকারক, শুক্র ও বল-

বর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, বর্ণকর, স্বাদু, গুরুপাক এবং শীতল।

অধিক পরিমাণ আম্র ভক্ষণে অগ্নিমান্দ্য, বিষমজ্বর, রক্তাময়, কোষ্টবদ্ধতা, উদররোগ এবং চক্ষু পীড়া উৎপাদন করে; এই নিমিত্ত অধিক পরিমাণ আম্র খাওয়া উচিত নয়; কিন্তু ইহা অম্ল আম্রের জন্য উক্ত হইয়াছে, মিষ্ট আম্রের জন্য নয়; কারণ মিষ্ট আম্রের নেত্রের হিতকারিত্বাদি গুণ আছে। অধিক আম্র খাইলে শুণ্ঠীমিশ্রিত জল অথবা সৌবর্চ্চল লবণের সহিত জীরক সেবন করিলে সে দোষ নিবারিত হয়।

আম্র বীজের গুণ।

"আম্র বীজং কষায়ং স্যাচ্ছর্দ্যতীসার নাশনম্।
ঈষদম্লঞ্চ মধুরং তথা হৃদয়দাহনুৎ॥"

আম্রবীজ কষায়, ঈষদম্ল ও মধুর রসযুক্ত বমন ও অতীসার নাশক এবং হৃদয় জ্বালার শান্তিকারক।

আম্র পল্লবের গুণ।

"আম্রস্য পল্লবং রুচ্যং কফপিত্ত বিনাশনম্।"

আম্রের পল্লব রুচিকর এবং কফ ও পিত্তনাশক।

ভগবান অগ্নিবেশ বিরচিত এবং মহামতি চরক ঋষি কর্ত্তৃক সংস্কৃত চরকসংহিতায় লিখিত হইয়াছে যে,

"রক্ত পিত্তকরং বাল মাপূর্ণং পিত্তবর্দ্ধনং।
পক্কমাম্রং জয়েদ্বায়ুং মাংস শুক্র বলপ্রদম্॥"

কাঁচা আম রক্তপিত্তজনক, আঁশযুক্ত অর্থাৎ মধ্য অবস্থার আম পিত্তবর্দ্ধক এবং পাকা আম বায়ু নাশক, মাংস, শুক্র ও বলজনক।

মহর্ষি সুশ্রুত লিখিয়াছেন যে,

"পিত্তানিল করং বালং পিত্তলং বদ্ধ কেশরং।
হৃদ্যং বর্ণ করং রুচ্যং রক্ত মাংস বল প্রদম্॥
কষায়ানুরসং স্বাদু বাতঘ্নং বৃংহণং গুরু।
পিত্তাবিরোধি সম্পক্ক মাম্রং শুক্র বিবর্দ্ধনম্॥"

কচি আম পিত্ত ও বায়ু বর্দ্ধক, কিঞ্চিৎ আঁশযুক্ত অর্থাৎ মধ্যাবস্থার আম পিত্ত কারক, পাকা আম হৃদয় প্রিয়, বর্ণকর, রুচিকারক, রক্ত,মাংস ও বলের বৃদ্ধি কারক, অল্প কষায় রসযুক্ত, মিষ্ট, বাত নাশক, পুষ্টি কারক, গুরু, পিত্তের অবিরোধী এবং শুক্র বর্দ্ধক।

মহর্ষি হারীত স্বীয় সংহিতায় লিখিয়াছেন যে,—

"অপক্ক মাম্রং ফলমেব শস্তং সংগ্রাহিপিত্তাসৃজি কোপনঞ্চ।

তথাবিপক্কং মধুরন্তু চাল্পং ভেদ্যং সপিত্তামর নাশনঞ্চ॥"

অপক্ক আম্র ফল ধারক বলিয়া প্রশস্ত এবং উহা রক্ত পিত্ত বর্দ্ধক। পক্ক আম্র মধুর, অল্প বিরেচক এবং পিত্ত রোগ বিনাশক।

মহামতি বাগ্‌ভট স্বীয় অষ্টাঙ্গ হৃদয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে,—

"বাত পিত্তাস্রকৃদ্বালং বদ্ধাস্থি কফ পিত্তকৃৎ।

গুর্ব্বাম্রং বাতজিৎ পক্কং স্বাদ্বম্লং কফ শুক্রকৃৎ।"

কচি আম বায়ু পিত্ত ও রক্ত বর্দ্ধক। আঁশ-যুক্ত অর্থাৎ মধ্যাবস্থার আম কফ ও পিত্তকারক। পাকা আম গুরু, বায়ু নাশক, মধুরাম্লরসযুক্ত, কফ ও শুক্র বর্দ্ধক।

মহাত্মা চক্রপাণিকৃত চক্রদত্ত গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে,—

"আম্রং বালং রক্ত পিত্তকরং মধ্যস্তু পিত্তলং।
পক্কং বর্ণকরং রুচ্যং মাংস শুক্রবল প্রদং॥
পিত্তাবিরোধী বাতঘ্নং হৃদ্যং গুর্ব্বানুলোমনং।

কচি আম রক্ত ও পিত্তকারক, মধ্যাবস্থার আম্র পিত্তকারক, পক্ক আম্র বর্ণকারক, রুচিকর, মাংস, শুক্র ও বল বর্দ্ধক, পিত্তের অবিরোধী, বায়ু নাশক, হৃদয়ের প্রিয়, গুরু ও অনুলোম কারক।

আম্রকেষী অর্থাৎ আম্র বীজের শস্যের গুণ সম্বন্ধে ইংরেজী মত।

ডাক্তারকার্ক পাট্রিক বলেন, তিনি আম্রেরকেষী চূর্ণ ১০ হইতে ১৫ রত্তি মাত্রায় ব্যবহার করিয়া কৃমি রোগে উৎকৃষ্ট ফল লাভ করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন ইহাতে অধিক পরিমাণে গ্যালিক এসিড্ আছে, এই নিমিত্ত তিনি ইহাকে রক্তস্রাবী অর্শ ও রজোরোগে প্রয়োগ করিতে পরামর্শ দেন।

আর্য্য চিকিৎসা গ্রন্থে আম্র দ্বারা 'আম্র পাক'

নামে একটী বৃহৎ ঔষধ প্রস্তুত হইবার বিধি আছে যথা,—

“পক্কাম্রস্য রসদ্রোণে সিতামাঢ়ক সম্মিতাং।
ঘৃতং প্রস্থ মিদং দদ্যান্নাগরস্য পলাষ্টকং॥
মরিচং কুড়বোম্মানং পিপ্পলী দ্বিপলোম্মিতা।
সলিল স্যাঢ়কং দত্বা সর্ব্বমেকত্র কারয়েৎ॥
বিপচেম্মৃণ্ময়ে পাত্রে দারুদর্ব্ব্যা প্রচালয়েৎ॥
চূর্ণান্যেষাং ক্ষিপেত্তত্র ঘণীভূতেহ্ বতারিতে॥
ধন্যাকং জীরকং পথ্যাং চিত্রকং মুস্তকং ত্বচং।
বৃহজ্জীরক মপ্যত্র গ্রন্থিকং নাগ কেশরং॥
এলাবীজং লবঙ্গঞ্চ পৃথক্ জাতীং পলং পলং।
সিদ্ধং শীতে প্রদদ্যাচ্চ মধুনঃ কুড়ব দ্বয়ং॥
ভক্ষয়েদ্ ভোজনাদর্ব্বাক্ পল মাত্র মিদং নরঃ।
অথবা নিয়তা নাত্র মাত্রাং খাদেদ্ যথা নলং।
মানবঃ সেবনাদস্য বাজীব সুরতে ভবেৎ॥
সমর্থো বলবান্ পুষ্টো নিত্যং সস্যান্নিরাময়ঃ।
গ্রহণীং নাশয়েদেষ ক্ষয়ং শ্বাস মরোচকং।
অম্ল পিত্তং মহাশ্বাসং রক্ত পিত্তঞ্চ পাণ্ডুতাং॥
বৃহজ্জীরকঃ মঙ্গরৈলা।
ইতি আম্র পাকঃ।

সুপক্ক আম্রের রস ১॥৪ চৌষট্টি সের (১) চিনি /৮ আট সের, ঘৃত /৪ চারি সের, শুঁঠ চূর্ণ /১ এক সের, মরিচ চূর্ণ /॥ আধ সের, পিপুল চূর্ণ /। এক পোয়া, এবং জল ।৬ ষোল সের, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া মৃত্তিকা পাত্রে পাক করিবে, পাক কালে কাষ্ঠের হাতা দ্বারা লাড়িতে থাকিবে, পরে উহা গাঢ় হইয়া আসিলে পাক হইতে নামা-ইয়া তাহাতে ধনে, জীরা, হরিতকী, চিতামূল, মুতা, দারুচিনি, বৃহজ্জীরা, পিপুল মুল, নাগেশ্বর, এলাইচ, লবঙ্গ, ও জাতীপুষ্প এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের ৵ আধ পোয়া পরিমাণ চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে; শীতল হইলে উহাতে /১ এক সের মধু মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। আহারের পূর্ব্বে মনুষ্য এই ঔষধ একপল অর্থাৎ আট তোলা মাত্রায় সেবন করিবে, অথবা মাত্রা নিরুপণের প্রয়োজন নাই, অগ্নির বলাবল বিবেচনা করিয়া উহা সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে মানব অশ্বের

---

(১) কবিরাজী মতে চৌষট্টি তোলায় /১ সের হয়, সুতরাং আম্রপাকের লিখিত সের প্রভৃতি ও সেই নিয়মের অধীন বুঝিতে হইবে।

ন্যায় মৈথুন শক্তি সম্পন্ন, তেজস্বী, বলবান, হৃষ্ট পুষ্ট ও নিয়ত অরোগী হয় এবং ইহাদ্বারা গ্রহণী, ক্ষয়, শ্বাস, অরুচি, অম্লপিত্ত, মহাশ্বাস, রক্তপিত্ত ও পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

১। "আম, জাম, ও অর্জুন বৃক্ষের ছাল শীতল জলে ভিজাইয়া এবং ছাকিয়া মধু সহ পান করিলে আভ্যন্তরিক রক্তস্রাব ও অতিসার নিবারিত হয়। শার্ঙ্গ ধর।

২। আমের কেশী ও বিল্ব শুণ্ঠির ক্বাথ মধু ও শর্করা সহ সেবনে ছর্দ্দ্যতিসার নষ্ট হয়।

ভাব প্রকাশ।

৩। আমের কেশী, লোধ, বিল্ব শাঁস ও প্রিয়ঙ্গু, তণ্ডুলাম্বু ও মধু সহ পক্কাতিসার নাশার্থ সেব্য। ঐ।

৪। আম্রসী, সৈন্ধব লবণ সহ তাম্র পাত্রে ঘর্ষণ করিয়া লেপ দিলে চর্ম্মদল নষ্ট হয়। ঐ।

৫। আম্র ও জম্বুর ত্বকের ক্বাথ খই চূর্ণ সহ সেবনে গর্ভিণীর গ্রহণী রোগ আরোগ্য হয়।

৬। আম্রের কেশী, খই, সৈন্ধব ও মধু সহ সেবনে শিশুর ছর্দ্দি নিবারণ হয়। ঐ।,,

ভারত ভৈষজ্য তত্ত্ব।

আম্রাবর্ত্ত।

ইহাকে আম্রাবর্ত্ত, আমস্বত্ব বা আমতা বলে। ইহার প্রস্তুত সম্বন্ধে সংস্কৃত ভাব প্রকাশ গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে,

"পক্কস্য সহকারস্য পটে বিস্তারিতোরসঃ। (১)
ঘর্ম্মশুষ্কো মুহুর্ভ আম্রাবর্ত্ত ইতি স্মৃতঃ॥

পাকা আমের রস বস্ত্রোপরি পুনঃ পুন বিস্তা-রিত (লেপন) করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লই-লেই তাহাকে আম্রাবর্ত্ত বলা যায়।

এক্ষণে কেহবা মাহুরে, কেহবা পাটীতে কেহবা পাথরের থালায় কিম্বা রিকাবে এবং কেহবা কাঠের বারকোষ ইত্যাদিতে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পাকা আমের রস শুষ্ক করিয়া আম্রাবর্ত্ত প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

---

(১) কটে বিস্তারিতোরসঃ।

কটে—মাহুরে। ইতি রাজনির্ঘণ্ট।

আম্রাবর্ত্তের গুণ সম্বন্ধে ভাব প্রকাশে লিখিত হইয়াছে যে,—

"আম্রাবর্ত্ত তৃষাছর্দ্দিবাত পিত্ত হরঃ সরঃ।
রুচ্যঃ সূর্য্যাংশুভিঃ পাকাল্লঘুশ্চ সহিকীর্ত্তিতঃ॥

আম্রাবর্ত্ত তৃষ্ণা, বমন, বায়ু ও পিত্ত নাশক, রুচি কারক এবং সূর্য্যরশ্মি দ্বারা পাক হওয়া নিবন্ধন লঘু বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

দুগ্ধের সহিত আম্রাবর্ত্ত খাইতে বে'শ সুস্বাদু। আম্রাবর্ত্ত যত্ন পূর্ব্বক তৈল কিম্বা ঘৃতের ভাণ্ডে রাখিয়া দিলে এবং মধ্যে মধ্যে রৌদ্র লাগাইলে প্রায় এক বৎসর পর্য্যন্ত ব্যবহার যোগ্য থাকে।

আম্র পেষী।

আম্রপেষীকে সাধারণতঃ আমসী বা আমচুর বলিয়া থাকে।

আম্রপেষী দুই প্রকার প্রস্তুত হইয়া থাকে, এক কাঁচা আমের অপর পাকা আমের। প্রস্তুত প্রণালী উভয়ের একই প্রকার।

প্রথমতঃ আম্রগুলির ত্বক্ ফেলাইয়া দিবে,

পরে প্রত্যেকটী আম লম্বা ভাবে দুই খণ্ড করিয়া উহার অভ্যন্তরস্থ বীজ পরিত্যাগ করিবে। অনন্তর ঐ দ্বিখণ্ডিত আম্র সকল লম্বাভাবে পাত্‌লা পাত্‌লা করিয়া কাটিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইলেই আম্র-পেষী প্রস্তুত হইল।

আম্রপেষীর গুণ সম্বন্ধে সংস্কৃত চক্রদত্ত গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে,—

"আম্রপেষী কষায়াম্লা ভেদিনী কফ বাতজিৎ।"

আম্রপেষী অর্থাৎ আমচুর কষায়াম্ল রসযুক্ত ভেদ কারক এবং কফ ও বায়ু নাশক।

আম্রপেষী সকলে কিঞ্চিত হরিদ্রাচূর্ণ ও লবণ সং-যোগে যত্ন পূর্ব্বক কোন তৈল কিম্বা ঘৃতের ভাণ্ডে রাখিয়া দিলে এবং মধ্যে মধ্যে রৌদ্র লাগাইলে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অবিকৃত থাকে।

আম্রের প্রপানক।

(পানা)

"আম্রমামং জলেস্বিন্নং মর্দ্দিতং দৃঢ় পাণিনা।
সিতা শীতাম্বু সংযুক্তং কর্পূর মরিচান্বিতম্॥

প্রপানকমিদং শ্রেষ্ঠং ভীমসেনেন নির্ম্মিতম্‌।
সদ্যোরুচি করং বল্যং শীঘ্র মিন্দ্রিয় তর্পনম্‌॥
ইতি ভাব প্রকাশঃ।”

কাঁচা আম জলে সিদ্ধ করিয়া পরে তাহাকে ঐ জল হইতে উঠাইয়া হস্তদ্বারা দৃঢ়রূপে মর্দ্দন করিবে। তৎপরে উহার সহিত শর্করা, শীতলজল, কর্পূর এবং মরিচচূর্ণ সংযোগ (মিশ্রিত) করিলে উৎকৃষ্ট প্রপানক প্রস্তুত হয়। ইহা ভীমসেন কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই প্রপানক (পানা) সদ্যরুচিকর, বলপ্রদ ও ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকারক।

আম্রের মোরব্বা।

ত্বক্‌ ও বীজ রহিত কাঁচা আম্র খণ্ড	/১ এক সের
সফেদা	৫ পাঁচ তোলা
ফট্‌কিরী	১ এক তোলা
চিনি	/২ দুই সের
ছোট এলাচি চূর্ণ	॥ আধ তোলা
গোলাপ জল	১ এক তোলা

প্রস্তুত প্রণালী।

প্রথমতঃ আম্র খণ্ড সকল বংশ সলাকা দ্বারা

ছিদ্র ছিদ্র করিয়া, সফেদা ও ফট্‌কিরী মিশ্রিত শীতল জলে ডুবাইয়া রাখিবে। এক ঘণ্টা পরে তাহা হইতে ঐ আম্র খণ্ড গুলি উঠাইয়া পরিষ্কৃত জলে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া নিবে। পরে /২ দুই সের চিনি, রসের নিমিত্ত জলের সহিত জ্বালে উঠাইয়া তাহার ময়লা কাটিয়া উহাতে ঐ আম্র খণ্ড গুলি ঢালিয়া দিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। যখন শিরা একতার বান্ধিয়া উঠিবে, তখন উহাকে জ্বাল হইতে নামাইয়া উহার সহিত গোলাপ জল ও ছোট এলাচি চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লইলেই আম্রের মোরব্বা প্রস্তুত হইল।

—ঃ০ঃ—

পাকা আমের বরফী।

পাকা আমের রস /৪ চারি সের।

ছোট এলাচি চূর্ণ ৪ চারি তোলা।

প্রস্তুত প্রণালী।

আমের রস কোন রূপার বা কালাইকরা পাত্রে জ্বালে উঠাইয়া তন্মধ্যে অল্প অল্প ঘৃত দিবে এবং রূপা বা কাষ্ঠের হাতা দ্বারা ঘন ঘন আলোড়ন করিয়া ক্ষীরের ন্যায় গাঢ় হইলে নামাইয়া লইবে।

তৎপর চিনির গোচ্ছাবন্ধ শিরা (১) প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্যে সেই আমের গাঢ় রস দিবে। অনন্তর তাহাতে ছোট এলাচি চূর্ণ দিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া এক পাত্রে ঢালিয়া বরফী কাটিয়া লইবে।

পাকা আমের বুঁদিয়া।

পাকা আমের রস	...	/১ একসের।
বুটের বেশন (উত্তম বুট চূর্ণ)	...	/। একপোয়া।
এলাচি চূর্ণ	...	॥০ আধ তোলা।

প্রস্তুত প্রণালী।

আমের রস ছাকিয়া তাহাতে বুটের বেশন দিয়া হস্ত দ্বারা আলোড়ন করিয়া উত্তম রূপে মিশাইয়া লইবে। পরে ঘৃতপূর্ণ কাড়াই জ্বালে উঠাইয়া দিবে ; ঘৃত উত্তপ্ত হইলে ঝাঁজরা হাতাতে পূর্ব্ব প্রস্তুতি আম্রের রস লইয়া হস্ত দ্বারা তাহা ঐ হাতার ছিদ্রপথে প্রতপ্ত ঘৃতে নিক্ষেপ করিয়া বুঁদিয়া ভাজিয়া লইবে। পরে চিনির একতার বন্ধরসে ঐ বুঁদিয়া ডুবাইয়া রাখিবে এবং ঐ সময় উহাতে ছোট এলাচি চূর্ণ প্রদান করিবে।

---

(১) গাঢ় শিরা।

আমের আচার।

কাঁচা আম (আঁটি শক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত)

	...	/৫ পাঁচ সের।
আদা	...	৶ আধ পোয়া।
কৃষ্ণজীরা	...	৭ সাততোলা।
মৌরী	...	৭ সাত তোলা।
বুট	...	৶ আধ পোয়া।
গোল মরিচ	...	৩৷৷০ সাড়ে তিন তোলা।
লঙ্কা মরিচ	...	৩৷৷০ ,, ,, ,,
লবণ	...	৶ আধ পোয়া।

প্রস্তুত প্রণালী।

আম্র ও কৃষ্ণ জীরা ব্যতীত সমস্ত দ্রব্য উত্তমরূপে পেষণ করিয়া লইবে। পরে আমের ত্বক ছুলিয়া এবং প্রত্যেকটী আম লম্বালম্বি অর্দ্ধেক পরিমাণ কাটিয়া তন্মধ্য হইতে বীজ বাহির করিয়া ফেলিবে। তৎপর সমস্ত পেষিত দ্রব্য ও কৃষ্ণ জীরা একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রত্যেকটী আম্রের মধ্যে পূরিয়া সূতা দ্বারা পেচিয়া নেবুর রসে ডুবাইয়া রাখিবে এবং তন্মধ্যে লবণ দিবে। পরে তিন দিন পর্য্যন্ত রৌদ্রে দিয়া ইচ্ছা হইলে ঐ

নেবুর রসেই রাখিয়া দিবে অথবা নেবুর রস হইতে উঠাইয়া তৈলে ডুবাইয়া রাখিবে।

আমের আচার।

২য় প্রকার।

শর্ষপ চূর্ণ (আমের পরিমাণ অনুসারে)
$\frac{3}{4}$ অর্থাৎ বার আনা পরিমাণ।
হরিদ্রা চূর্ণ (ঐ) $\frac{1}{4}$ অর্থাৎ চারি আনা পরিমাণ।

প্রস্তুত প্রণালী।

কাঁচা আমের আঁটি অপেক্ষাকৃত শক্ত হইলে ঐ আম লম্বালম্বি চিরিয়া দুইখণ্ড করিবে। পরে আঁটির মধ্যস্থ সারভাগ (শুভ্রাংশ) দূর করিয়া ফেলিবে। তৎপর শর্ষপ চূর্ণ ও হরিদ্রা চূর্ণ একত্রে মিশ্রিত করিয়া ঐ কর্ত্তিত আম্রের বীজশূন্য স্থানে পূরিয়া উভয় খণ্ড পরস্পর সংযোগ করতঃ এক একটী বংশ শলাকা দ্বারা আবদ্ধ করিয়া দিবে। অনন্তর শর্ষপ তৈলপূর্ণ মৃত্তিকা পাত্রে ঐ আম্রগুলি ডুবাইয়া পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে। এবং সময় সময় রৌদ্রে দিবে। এইরূপে আম অনেক দিন পর্য্যন্ত অবিকৃত থাকে এবং আচাররূপে

পরিণত হইয়া উপাদেয় খাদ্য মধ্যে পরিগণিত হয়।

আমের আচার।

৩য় প্রকার।

কাঁচা আম	...	/৫ পাঁচ সের।
কাল জীরা	...	৭ সাত তোলা।
মেথী	...	৭ ,, ,,
ধনিয়া	...	৭ ,, ,,
হরিদ্রা চূর্ণ	...	৭ ,, ,,
লবণ	...	৵ আধ পোয়া।

প্রস্তুত প্রণালী।

কাঁচা আমের আঁটি অপেক্ষাকৃত শক্ত হইলে ঐ আমে কোনরূপ আঘাত না লাগে এই ভাবে গাছ হইতে পাড়িয়া আনিবে। পরে প্রত্যেকটী আমের প্রায় বার আনা অংশ লম্বালম্বি চিরিয়া আঁটির অভ্যন্তরস্থ অৰ্দ্ধাংশের শাঁস (শুভ্রাংশ) ফেলাইয়া দিবে, অপর অৰ্দ্ধাংশ ঐ আম্রের মধ্যেই রাখিয়া দিবে। পরে কালজীরা, মেথী ও ধনিয়া পৃথক পৃথক ভাজিয়া চূর্ণ করিবে; অনন্তর ঐ চূর্ণত্রয় এবং হরিদ্রা চূর্ণ ও লবণ একত্র মিশ্রিত করিয়া

প্রত্যেকটী আম্রের অভ্যন্তরস্থ বীজশূন্য স্থানে তাহা পূরিয়া এক একটী বংশ শলাকা বিদ্ধ করিয়া আম্র গুলির দ্বিখণ্ডিত অংশ (মুখ) সংযুক্ত করিয়া দিবে। তৎপর ঐ আম্রগুলি এক দিবস রৌদ্রে রাখিবে ও পরে একটী মৃত্তিকা পাত্রে ভরিয়া ঐ পাত্রটী তৈলপূর্ণ করিবে। তৈল কম হইলে আম-গুলি পচিয়া যাইবার সম্ভাবনা, এই নিমিত্ত আম্র-গুলি যাহাতে তৈলে ডুবিয়া থাকে এরূপ করা উচিত। পরে কোন উষ্ণস্থানে ঐ আচারপূর্ণ পাত্র রাখিয়া দিবে।

আমের আচার।

৪র্থ, প্রকার।

কাঁচা আম	...	/৫ পাঁচ সের।
ভাজা কালজীরা চূর্ণ	...	৭ সাত তোলা।
ভাজা মেথী চূর্ণ	...	৭ ,, ,,
ভাজা ধনিয়া চূর্ণ	...	৭ ,, ,,
হরিদ্রা চূর্ণ	...	৵ আধ পোয়া।
লবণ	...	৵ ,, ,,
রাই শর্ষ্যা চূর্ণ	...	/॥ আধসের।

প্রস্তুত প্রণালী।

প্রথমতঃ প্রত্যেকটী আম লম্বালম্বি চারিভাগ করিয়া চিরিবে এবং ঐ খণ্ডগুলি পৃথক পৃথক না করিয়া বোঁটার দিগে সংলগ্ন রাখিবে ও আঁটি বাহির করিয়া ফেলিবে। পরে উপরের লিখিত সমস্ত মসল্লাদি একত্রে মিশ্রিত করিয়া তাহার কিছু কিছু প্রত্যেকটী আম্রে পূরিয়া ঐ আম্রগুলি কোন মৃত্তিকা পাত্রে রাখিবে। অনন্তর ঐ পাত্র সমেত আম্রগুলিকে তিন চারি দিন পর্য্যন্ত রৌদ্রে দিবে। পরে পাত্রটী তৈল পূর্ণ করিয়া কোন ভাল স্থানে রাখিয়া দিবে।

আমের আচার।

৫ম প্রকার।

পশ্চিম অঞ্চলে এই প্রকার আচারকে "গল্‌কী" বলে।

কাঁচা আম	...	/৫ পাঁচ সের।

প্রস্তুত প্রণালী।

আঘাত লাগিতে না পারে এই ভাবে কতকটী আম পাড়িয়া আনিয়া তাহার ত্বক্‌ ফেলাইয়া দিবে। পরে ঐ আমগুলি লম্বালম্বি চিরিয়া

তাহার অভ্যন্তরস্থ বীজ নিস্কাশিত করতঃ জল দ্বারা ধৌত করিয়া কিছুকাল রৌদ্রে রাখিয়া দিবে, জল শুষ্ক হইলে তাহার মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণ লবণ দিয়া একটী মৃত্তিকা ভাণ্ডে ঐ আম্রগুলিকে এরূপ ভাবে তিন চারি দিন পর্য্যন্ত লাড়া চাড়া করিবে যে ঐ লবণ আম্রের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। তৎপর ৪নং আচারের লিখিত সমস্ত মসল্লা উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া ঐ ভাণ্ডস্থ আম্রগুলির নীচে ও উপরে কতকটা তৈল দিয়া একখানা কাপড় দিয়া ভাণ্ডের মুখবন্ধ করিয়া কোন ভাল স্থানে রাখিয়া দিবে।

আমের আচার।

৬ষ্ঠ, প্রকার।

কাঁচা আম	...	/৫ পাঁচ সের।
ভাজা কালজীরা চূর্ণ	...	৭ সাত তোলা।
ভাজা মেথী চূর্ণ	...	৭ ,, ,,
ভাজা ধনিয়া চূর্ণ	...	৭ ,, ,,
লঙ্কা চূর্ণ	...	৩৷৷০ সাড়েতিন তোলা।
হরিদ্রা চূর্ণ	...	৴ আধ পোয়া।

লবণ	...	৵ আধ পোয়া।
শর্ষপচূর্ণ	...	⁄॥ আধ সের।

প্রস্তুত প্রণালী।

প্রথমতঃ আম্রগুলি ত্বক ও বীজ শূন্য করিয়া ছেঁচিয়া লইবে এবং চব্বিশ ঘণ্টা কাল কোন কাষ্ঠের পাত্রে রাখিয়া দিবে। পরে উপরের লিখিত মসল্লাদি সমস্ত দ্রব্য ঐ ছেঁচা আমের সহিত মিশ্রিত করিয়া উহার এক এক ছটাক পরিমাণ এক এক খানা পাৎলা নেকড়ায় বান্ধিয়া গুলি প্রস্তুত করিবে। অনন্তর ঐ গুলি সকল রৌদ্রে কিছু শুষ্ক করিয়া একটী মৃত্তিকা পাত্রে কতকটা তৈল দিয়া তাহার মধ্যে রাখিয়া দিবে।

আমের চাট্নী।

কাঁচা আম	...	⁄৫ পাঁচ সের।
আদা	...	৵ আধ পোয়া।
ধনিয়া	...	৵ ,, ,,
কালজীরা	...	৵ ,, ,,
পুদিনা	...	৵ ,, ,,
গোল মরিচ	...	৩॥০ সাড়ে তিন তোলা।

লঙ্কা মরিচ	...	৩৷৷০ সাড়ে তিন তোলা।
লবণ	...	⁄। এক পোয়া।
লবঙ্গ	...	২ দুই মাসা।
ছোট এলাচি	...	২ ,, ,,
শর্ষপ তৈল	...	⁄। এক পোয়া।
গুড়	...	৵ আধ পোয়া।

প্রস্তুত প্রণালী।

প্রথমতঃ আমগুলি ছুলিয়া পাৎলা পাৎলা করিয়া কাটিয়া রৌদ্রে রাখিবে। যখন উহার সমস্ত রস শুষ্ক হইয়া যাইবে, তখন কালজীরা ব্যতীত সমস্ত মসল্লা, লবণ ও গুড়ের সহিত ঐ আম্রখণ্ড সকল ⁄১ এক সের লেবুর রসে উত্তম রূপে পেষণ করিয়া তাহাতে আস্ত কালজীরা ও তৈল মিশ্রিত করিয়া লইবে। তৎপর উহা একটী চিনের পাত্রে সপ্তাহকাল রাখিয়া দিবে। এক সপ্তাহ পরে ঐ চাট্‌নী ব্যবহারের উপযোগী হইবে।

আমের চাট্‌নী।

২য় প্রকার।

কাঁচা আম	...	⁄। এক পোয়া।
লাল চিনি (মোটা চিনি)	...	৵ আধ পোয়া।
ধনিয়া	...	২ দুই তোলা।
লবঙ্গ	...	২ দুই মাসা।
ছোট এলাচি	...	২ ,, ,,
গোলমরিচ	...	২ ,, ,,
লঙ্কামরিচ	...	১ এক তোলা।
লবণ	...	৩ তিন মাসা।

প্রস্তুত প্রণালী।

ছোট (কড়েয়া) আমগুলি উত্তপ্ত ভস্মের মধ্যে কিছুকাল খুসিয়া রাখিবে। উষ্ণ ভস্মের উষ্ণতায় ঐ গুলি নরম হইলে পর ভস্ম হইতে বাহির করিয়া উহার অভ্যন্তরস্থ বীজ পৃথক করিয়া ফেলিবে। পরে ঐ আম অপর সমস্ত দ্রব্যের সহিত পেষণ করিয়া লইলেই উৎকৃষ্ট চাট্‌নী প্রস্তুত হইল।

আমচূরের চাট্‌নী।

গুড়ের শির্‌কা	...	/২ দুই সের।
আমচুর	...	/১ এক সের।
আদা	...	/১ এক সের।
গুড়	...	/১ ,, ,,
লবণ	...	/৷৷ আধ সের।
কালজীরা	...	৵ আধ পোয়া।
গোলমরিচ	...	৵ আধ পোয়া।
লবঙ্গ	...	/ এক ছটাক।
বড়এলাচি	...	/ ,, ,,

প্রস্তুত প্রণালী।

কালজীরা ব্যতীত সমস্ত দ্রব্য শির্‌কা দ্বারা উত্তমরূপে পেষণ করিয়া তাহার সহিত অবশিষ্ট সমস্ত শির্‌কা ও কালজীরা মিশ্রিত করিবে। পরে উপর্য্যুপরি তিন দিবস পর্য্যন্ত রৌদ্র লাগাইলেই চাট্‌নী ব্যবহারের উপযোগী হইবে।

সম্পূর্ণ।